গেওয়ারিয়ার আশ্রমে প্রবেশ।

আজ্ঞা গোষ্ঠীর মহাশয় গেওয়ারিয়ার নতুন বাড়িতে আসিলেন। আশ্রমে যাইয়া দেখি ১৩৫ ভাব ও সহস্রের ধরিতে স্থান মহা সন্তান, অনন্দের ধাম হইয়াছে। বলা হইয়া ১১২ পর্যন্ত হরিসিদ্ধির গোষ্ঠianeর-কৌর্তন ও নামাঙ্গন হইল। বিক্রমের অন্যেকে আসিয়াছিলেন। গৌর-কৌর্তন তুলিয়া কাহারও কাহারও অঙ্গ বোধ হওয়ায় চলিয়া গেলেন; কোন কোন এইদিক ব্রাষ্ট শেষ পর্যন্ত উৎসবে রহিলেন। একটা ধামায় করিয়া কতকগুলি বাতাসা হইয়া গোষ্ঠীর মহাশয় নিজ মন্ত্রের ধরিয়া রহিলেন, পরে তাহা চারিদিকে ‘হরিবেল’ ‘হরিবেল’ বলিয়া ছড়াইয়া দিলেন। একাধিক হইয়া ‘হরির লুট’ দিতে গোষ্ঠীর মহাশয়কে অজ্ঞাত পথে দেখিলাম।

পরে গোষ্ঠীর মহাশয় পূজের ঘণ্টা দক্ষিণমুখে হইয়া আসন করিলেন। বহুক্ষণ এ ঘণ্টা কৌর্তনাদি হইল। সুনিবাস, আগামী বল্লূরসার হইবে, মহা উৎসব হইবে। সঙ্কার সময়ে বাসায় আসিলাম।

আশ্রম-সংলগ্ন উৎসব।

প্রত্যয়ে নানাটে গেওয়ারিয়া-আশ্রমে আসিয়া উপডিত হইলাম। হিন্দু, বৃন্দ, বৈষ্ণববাদ
১৩৫ ভা। হইয়া, ১২০৫ ;
অনন্দের বহু সহায়তা হইল। সহস্রের মহাশয়ের আজ্ঞা বহু সহায়তা মাতিলেন। বহুক্ষণ
ব্যাপিয়া উৎসব হইল। ভিতরে বাড়িতে ৩৫ মণ কৌর্তন করিল।
মুসলমান ফকির ও তাহদের বীরবৃত্তের সূচনায় উৎসবের অনন্দ আরও রুপি পাইল।
বলা হইয়া ১২২ পর্যন্ত ছুট ভাবে চারিদিক ছিল। পরে গোষ্ঠীর মহাশয় বহুদিন হরির লুট
বিভরণ করিল। পূজের ঘণ্টা আসন আসন নিজ নিজ আবাসে চলিয়া গেলেন। ধারায় হইলেন, তাহারা আশ্রমে করিলেন। আমি গোষ্ঠীর মহাশয়ের নিকটে বসিরা রহিলাম। গৌসাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যাহা না ?” আমি বলিলাম, আমাদের পাইব। বলা হইয়া ২২ পর্যন্ত গোষ্ঠীর মহাশয় আমাকে
লইয়া উভার ঘণ্টা আর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সেখানে আমারা গৌসাই ১০।২২ গুরুক্ষণের
কাহারও আসান দিলেন। অজ্ঞাত গৌসাইর আসান আমি
প্রথম খণ্ড।

প্রথম পাঁচিলাম। একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যালাম। আমাদের সঙ্গে জুড়ে তাদের পার্থক্য নাই; তিনি অন্য গোসাইয়ের ভোজনপাত্রব্যাপারে নিঃসংখ্য নিজেই এসাদ তুলিয়া। নিয়া খাওয়া লাগিলেন! গুরু-শিষ্যের এই প্রকার ভাব আর কোথাও দেখি নাই।

দর্শনাদিসম্বন্ধে উপদেশ। অলোকিককে চরণমুক্তলাভ।

সন্ধ্যাকালে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সহিত গোসাইরিয়া-আশ্রমে পাঁচিলাম। গোসাইরিয়া মহাশয়ের নিকটে বসিয়া আছি এমন সময়ে হরিচরণ বাবু, প্রসন্ন বাবু, ২১শে ভাদ্র, ১২৩১। হরিচরণ বড়ো মহাশয় প্রভু আলিয়া উপস্থিত হইলেন। গোসাই বড়ো সমাধিস্থ ছিলেন। ঐ সময়ে অত্যন্ত-বাড়িয়াখানা অল্প-কুটি-সরে ধীরে ধীরে বিলতে লাগিলেন,—"সাধনের সময়ে আপনারা যিনি যাহা দেখেন, কল্পনা মনে করবেন না। ঐ সাধন এমনই জিনিস যে এসব দেখে তাই হবে। প্রথম অবস্থায় এসব দর্শন চক্র ও ক্ষণ্যশারী হয়; চিন্তার নির্মলতা ও প্রতিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এসব ক্রমেই স্পর্শ্ব ও দীর্ঘকালশ্রীয় হ’তে দেখা যায়। প্রথম প্রথম একখানি চার্বির মত, পাটীর মত, ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিতে থাকে; পরে ধীরে ধীরে উত্তরাধিকার নৃত্য রুপে জীবন্ত দেখা যায়; কাতাবার্তাতে শুনা যায়; উহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে উত্তর পাওয়া যায়। শুধু জীবন্তই দর্শন হয় তাহা নয়, উহাদের হাত পা নাড়া ইঙ্গিতও দেখা যায়। এ সাধনে শুধু আমাদের দেশের দেবদেবীরাই যে দর্শন হয় তাহা নয়; এ পর্যন্ত ভগবানকে যে কোন দেশে যে কোন রূপে লোকে পূজা করছেন,—আপনারা অত্যন্ত থাকুন, আর নাই থাকুন—সাধনপ্রভাবে ধীরে ধীরে সে সমস্তই জীবন্তরূপে প্রতাপ হবে। পূর্বে সেই সময়ে, রোমে ও অঞ্চলে দেশে, এমন কি পাহাড়ে-পার্বত্তে অসভ্য লোকেরাও এই পর্যন্ত ভগবানকে যিনি যে রূপে পূজা করছেন ও করছেন, সমস্ত প্রকাশিত হ’য়ে পড়তে। এসব কল্পনার কথা বলছি না, এ সমস্ত বিষয় সত্য, প্রতাপ। প্রথম হ’তেই যদি এ সব কল্পনা মনে ক’রে থাকে তাহা যায়, একবারে উড়িয়া দেওয়া যায়, তবে সহজের পথ হারাতে যায়। কল্পনাই ভাবুন, আর যাই ভাবুন, এসকল প্রতাপ হবেই। ওসব সদা সূক্ষ্ম দেখা যায় না। তার কারণ, 'আমাদের চিন্তা সব সময়ে এক অবস্থায় থাকে না; চিন্তা স্মৃতি হলেই দর্শনটি পরিষ্কার হয়।
চিলা স্বল্প রাখিতে হ’লে, আসে প্রথমে নাম করতে হয়, পরবর্তে আচার নিয়ে থাকতে হয়। নামের রূপচার হ’লে ও চিলা নিশ্চিন্ত হ’লে একটি একটি ক’রে বাসনা কামনা ভাগ হতে থাকে। যে পরিমাণে বাসনা কামনা ভাগ হবে সেই পরিমাণে সফল প্রায়ক্ষ হবে। এইসকল দর্শনের অবস্থায় যোগের আসন্ত। যোগের একবার আসন্ত হ’লে আর বেশী দিন লাগে না। ক্রমে ক্রমে সব আচরণ বিষয় প্রায়ক্ষ হতে থাকে, যাহা কখন কল্পনা করা যায় না সে সব প্রায়ক্ষ ক’রে মান্য হয়।

অধিক রাজ্যে বাসা আত্মিক সময় আত্মস্বাধীন ব্রাহ্মণ শক্তিতে। তিনি নাটক গোবাড়ী মহাশয়ের অনৌপক ক্ষমতা ও অসাধারণ দর্শক অনেক কথা তুলিয়া, হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন—“দেখুন, আমি ব্রাহ্মণ সাক্ষ্যের লোক। ঠাকুরের চরণামৃত নিতে সাহস পাই না। প্রত্যহ রাজ্যের শেখার সময়ে মাথার কাছে একটি কাম্বল বাটি রাখিয়া মনে মনে প্রার্থনা করি যেন তিনি চরণামৃত রাখিয়া যান। আশ্চর্য ঐ দযা। প্রতিদিনই শেখার্থে উঠিয়া ঐ বাটিতে চরণামৃত পাই। এই ব্যাপার নিতাই ঘটিতেছে। আমি ব্যতিত আর কেহই এ বিষয় জানে না। অপনার ইচ্ছা হ’লে শোনার সময়ে কাম্বল বাটি রাখিয়া শোনেন, নিশ্চয়ই পাবেন।” বৃহস্পতি মহাশয় চিরকাল নিষ্ক্রিয় সত্যবাদী, আত্মস্বাধীন ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—“এ আবার কি? এরও এই অবস্থা। যাহা কখনও হতে পারে না, তার পরে করে কি? বৃহস্পতি মহাশয়কে বহুকাল জানি, তাহার উপরে সমাজের শ্রদ্ধা করিল না, মনে করিলাম, ‘মুনীনাথ মতিভাবঃ’, অথচ অন্য কোন রহস্যও ইহার ভিতরে থাকিতে পারে।”

প্রার্থক্ষের উপায়নির্দেশ।

বিকাল বেলা গোবাড়ী মহাশয়ের নিকটে গেলাম। নিজস্ব পাইয়া পিঙ্গাসা ২৪শে ভাদ্র, ১২৬২; করিলাম—“একটি নাম আমাকে জ্ঞাত করতে বলিয়াছি পাই, বলে শনিবার। দেখিয়াছি।”

গোসাই, হই, হই, সেই নামটিও জ্ঞাত করে, উপকার পাবে।

অন্য শনিবার বলিয়া অনেক লোকের মন্দামহনস হইল। প্রার্থক ও পুরুষকার সচেতন অনেক কথা হইল। গোসাই বলিলেন—সংসারে সকলেই প্রার্থকের আধি। যে ইচ্ছা যত চেষ্টা কর না কেন, প্রার্থক কার্যের গতি কেহই রৌখ করতে পারে না।
পুরুষকারনারী প্রাগুকের উপর আধিপত্য অস্তম। লোক পুরুষকারে সাময়িক উপকার পেতে পারে না; কিন্তু চিরকাল পারে না। ব্রহ্মচারী মহাশয়, পুরুষ-
কারের প্রভাবে প্রারম্ভ কর্ম্ম অতিশীঘ্র করে, সাধনের চতুর্থ অবস্থা পেরিয়ে গিয়েছিলেন; অবশেষে, নির্ভরসম্পন্নান্ত পৌর্ণিমায়, আবার ঠেকে ফিরে এলেন। পরে তিনি নাস্তা খেয়ে, ক্ষেত নিড়ায়, শুকর তাড়ায় কতকাল কাটালেন। অবশ্যা না পড়লে এসব কথা বুঝা যায় না। প্রারম্ভের হাত- থেকে রক্ষা পাবার জন্য শাস্ত্রে দুইটি উপায় বলেছেন—বিচার ও আচারপালান্ত। যখনই যাহা কিছু করলে, বিয়োগ্রীতার্থে করতে। উঠা বসা, স্নানারাঙ্গি যাবতীয় কার্য্য নিক্ষমভাবে বা বিয়োগ্রীতার্থে অনুষ্ঠিত হলেই শীঘ্র প্রারম্ভ কর্ম্ম শেষ হয়ে যায়। আর শাস্তি প্রাপ্তি নাম করলে আরও সহজে হয়।

গোষ্ঠী মহাশয়ের কথার অর্থ আমি বুঝিলাম না। প্রারম্ভে ঢোকিয়া, বাধা হইয়া অচরভৎ যে সকল কার্য্য করি, তাহাতে নিম্বক তার আনিব কি প্রকারে? আর বাচি প্রারম্ভ সনাহার ইত্যাদি কর্ম্ম তিত সাধন ভাবনার মত ভগবৎ-গ্রীতার্থে অনুষ্ঠান করিতেছি, ইহা মনে করিব বা কিরূপে পাই। শাস্তি প্রাপ্তি দশ মিনিটের নাম করিতে পারি না, কিন্তু হইয়া পড়ি। অবিচ্ছেদে খাস প্রাপ্তি ধরিয়া নাম করিবই বা কি প্রকারে? এখন বুঝিতেছি, এ সাধন নেওয়াই আমার ভূল হইয়াছে।

নগেন্দ্রবাবুর অসাম্প্রদায়িক উপদেশ।

সখিয়া গোষ্ঠী মহাশয়ের আজ ক্রান্তিমাত্র গেলেন। গোসাইকে দেখিয়া বার্তাগত অস্তম। আনান্দিত হইলেন। মধা-উৎসাহে সংসৈনিক আর্ন্ত হইল। তাহার মধ্যে ধূম-ধাম পত্তিয়া গেল। গোষ্ঠী মহাশয়ের কয়েকটি শিশু খুব মাত্রিয়া গেলেন। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া সকলেই বিশ্বাস হইত চারিয়া রহিলেন। শ্রীধর তার উমামত হইয়া ‘এই দেখুও, এই দেখুও, বলিয়া উঠিয়া হাস্তকেলপনাপূর্বক লক্ষ্য প্রদান করিতে আর্ন্ত করিলেন। সকলেই খুব আগুনের সহিত শ্রীধরকে দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রহ্ম শ্রীযুক্ত চরিচরণ গুপ্তার মহাশয়ের ২১৬ লােফে শ্রীধরের সন্ত্রে আসিয়া ‘এই দেখুও, এই দেখুও কিনে? এক অগ্নি-ময়, এক অগ্নি-ময়।’ বলিয়া চিত্তকার করিতে লাগিলেন।

প্রাচীন শ্রীযুক্ত নেহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বেদির কার্য্য করিয়া উপদেশ দিলেন। তিনি সত্ত্বেও বাক্যে, মধ্যপক্ষী ভাষায়, খুব জোরের সঙ্গে বলিলেন—'সাকার উপাসনাই কর,
আর নিয়ন্ত্রক উপাসনাকর, এইমাত্র দেখিয়ে যে, নিজের ঈশ্বরের বিশ্বাসী সহিত জড়িত ছিল কি না—ইত্যাদি। বাস্তবে আজ এভাবের উপদেশ শুনিয়া অভ্যস্ত বিষয়ক হইলে। অনেক বিলিপন—গোষ্ঠী মহাশয় আজ সমাজে উপস্থিত ছিলেন বলিয়াই, নগেন্দ্র বাবুর মৃত্যুহইতে একাধারের উপদেশ বাহির হইয়াছে।

সত্যনিষ্ঠায় উপদেশ।

আজ তিন দিন যাবৎ নিয়ত মনে হইতেছিল—বড়ো দাবিদার ছোট কথা। প্রিয়বানার জলে পড়িতো মরিয়াছে। সময়ে সময়ে উহার মৃত্যুধাম করিনাই আপনা আপনি মনে আসিয়া পড়িতেছিল। আমার গর্ভ পাইলেম যথাকথিত তাই। মনে বড়োই কষ্ট হইল। আমার নূপুর ভর্তা নিন্মাত্র বলিয়া, ঘরার ২ দিন পূর্বে ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া। চীংকারি করিয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ হয় কেন? ইহাতে মনে হই প্রাচীন একটা কিছু থাকিতেও পারে।

ভানন্দি বিপদে পড়িলাম। হিতের আদম্য কামের উত্তেজনা, বাহিরে একটার পর একটা ভীষণ প্রলেভন। এ আবহাও করি কি? বায়িচার করিয়া। কামের বেগ শান্তি করিব, স্থির করিলাম। কিছু ব্যবহার পাইতে গোষ্ঠীমহাশয়ের নিকটে গিয়া। উপনীত হইলাম। একটুকু বসিয়া ধাঁচার পর, তিনি নিজীকরিয়ে তীব্রতে বলিয়া লিখিলেন—

উপদেশ শুনে কি হয়? শুধু শুনে গেলে কিছুই হয় না। জীবনে উহা পরিণত করতে হয়। ইচ্ছা কলিতার সব-উপদেশ-মত চল। যাই না, সত্য। অনেকের ভাল হ'তে ইচ্ছা। আছে, চেষ্টা আছে; কিন্তু পরের উঠে না। সকল রিপুর উপরে সকলের সমান আধিপত্য নাই, এ খুব সত্য কথা। কিন্তু সত্য কথা তো লোকে ইচ্ছা কলিতার বলুতে পারে; তাই বা করে কই? সত্য কথা, সত্য ব্যবহার, সত্য চিন্তা—সকলেরই প্রয়োজন। এ তিনটি অভ্যস্ত হ'লে আর বড় উৎপাত থাকে না। ধর্মীয়প্রভাবের প্রথমে এই তিনটি অভ্যাস ক'রে নিতে হয়। পরে সবই সহজ হয়ে আসে, একটা সহজেই অভ্যস্ত হয়। এই তিনটি আগে অভ্যাস কর, সব উৎপাত শান্তি হয়ে যাবে।

এসব শুনিয়া আমি মনেহইম ওবার চলিয়া আসিলাম। তাবিশ্চিলাম, গোষ্ঠীমহাশয় বোগাচার্য্য, এসব উৎপাত শান্তির কতরক প্রলেভনা আনেন, একটা কিছু মৃত্যু-বলিয়া দিবেন। কিন্তু তিনিও তে দেখি ব্যাখ্যাসমূহের সেই পুরান নীতির গঠন-ই সারওজাইলেন।
মন্ত্রশিরের প্রমাণ।

আমাদের মাঠের বীরভূম সাগরচরণ পাল মহাশয়ের একমাত্র পুল আজ মৃত্যুব্যায়ে
১০ই আধিন, “শায়িত। আমর স৬২০টি সম্বন্ধক তুষারকে দেখিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ
মঞ্চলায়। সেখানে বলিয়া আছি একটি সাধুবিষ্ঠার বীর্য অক্ষাৎ ঐ
বাসায় অস্তিত্ব বলিয়া— ‘উপরি’ উপরে আপনাদের একটি ছেলে মাঝে পড়িতেছে।
আপনাদের প্রস্তুত হবে। আমি একটি কবর দিয়ে, ছেলেটি ভাল হয়ে যাবে। দৈববল আমি
এই কবর সংগঠন করিয়া দিব।” আপনাদের অবস্থায় সেই কিছু হ’বে না। একটি কবর করতে
যখনিক্ষিং করত হবে মাঝ।” মাঠের মহাশয় ভাসন গোড়া। বলিয়া, তিনি একবারের হে হে
করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন— কবর টবের কাজ নয়, সব দৈব-কৈব আমি
মানি না। যখন কি হে, বাপু কোন উপযোগ জন্য তো দাও। ওসব কিছু লিখায় করি না।”
আমরা সকলেই সাধু সাধুবিশ্বের মনে করিলাম— বেশ একটা অস্তিত্ব আসিয়া ফুটিল।
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— ‘ঠাকুর, দৈববল আমাদের কিছু দেখাতে পার?’ সাধু,
সাধুবিশ্বের কাহিন— ‘হী, নিশ্চয় পারি। ছেলেটির মহাবিশ্ব দেখে কবরের কথা লুকিয়া
উঠা নেওয়া না নেওয়া আপনাদের ইচ্ছামান। ইহাতে আমার কোন সার্থ নাই।’

দৈববল কিছু দেখাইবার জন্য সাধুটিকে খুন জেনে করিতে লাগিলাম। কেহ কেহ
ঠাকুর তামাসাও করিতে লাগিল। অবশেষে আপনারা নির্দেশ করিলেন—‘আচার, আপনারা
কি চাহেন, তবু’ আমরা সকলের তখন বলিলাম, ‘দৈববলে কিছু খাবার নিই আমি
দাও।’ ব্রাহ্মণ বলিলেন— এক ঘটি পরিকাশ ডিন দিও, আর ঘটি পরিকাশ করাইয়া
দিন।’ আমি মাত্র পড়িয়া যখন ‘আয় আয়’ বলিল, তখন ঐ ডিন সবে ছুটিয়া দিবেন।”
আমরা তৎশ্চাত্যা ধুঃখিন যখন একটি কবর করিতে লাগিলাম; ব্রাহ্মণ কে নিজেদেরই
একথান কাপড় পরিলাম, এবং একটি ডিন খাবার মধ্যে রাখিয়া আমরা প্রায়
১০০২ জনে সেই ব্রাহ্মণের চতুর্দিকে ছাড়াইলাম। খুব-সতর্কার সহিত উহার হাত-মুখ নাড়ার
উপরে তীক্ষ কর্ণ রাখিয়া লাগিলাম। রেল ৩টা আটটা হইবে। ব্রাহ্মণ প্রথমে প্রথম
ধরিয়া স্থিরমনে জো করিতে লাগিলেন; কিছুক্ষণের পরে একবারে ছাড়িয়া উঠিল।
হার পুকুর করিয়া কাপড়ে লাগিলেন। তখন তিনি উঠিয়া হাতপ্যাল তুলিয়া বার করেন
’আয় আয়’ বলিয়া কাহাকে সেন আহ্মান করিলেন। আমরা অমনী সেই ঘটির ডিন দরম্যান
ছিটাইয়া দিলাম। ব্রাহ্মণ তখন শুষ্ক হইতে একাংশ—প্রায় দুই সেন ‘পরিমাণ—একটা
মিশ্রের ডেলা লুভিয়া নিয়া। আমাদের কাছে ফেলিয়া দিলেন। এত বড় মিশ্রের খুটুটি কোথা।
হইতে যে কিছু ভাবে আসিল, একটাটা স্বেচ্ছাসেবক রাধিয়াও আমরা এতগুলি লোকের তাহার কিছুই ধরিতে পারিলাম না। কিন্তু হিন্দুতে মাঠার মহাশয়ের বিখ্যাত হইল না। তিনি স্পষ্টই বলিলেন,— "যদি তুমি ওসব কিছু নয়, কুসংসার! আমি কবর চাই না।" সাধুটি বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন। হইতে প্রায় এক ঘণ্টা পরেই ছোটটি স্থানে মৃত্যু হইল। মাঠার মহাশয়ের বিখ্যাত বল অন্তত! এই গার্দ ও মাঘ মাঘের তিন দিন গোকুলের নিকটে থাকিলেন। হইতে আমাদের পক্ষে একটি দৃষ্টান্ত বটে! কন্নুরের মিশ্রি বাণীয় অনিম্ন অমি একটি শিশুতে পুরী রাখিলাম, আত্ম কিছু হয় কি না দেখিব।

আহরসম্বন্ধে উপদেশ—আনন্দক্ষীন কথা।

মধ্যামে গোসাই মহাশয়ের নিকটে গেলাম। নিজস্বের অবকাশ পাইয়া বিলাস, ৩৩ আহল, ৩২৫: সাধনর সময়ে যে সব দর্শন হইত, এখন আর তাহা কিছুই গবেষণা। হয় না!‘

গোসাই। হয় না কেন? কোন প্রকারের অনিম্ন হয়েছে।

গোসাইর একটি শোনামাত্র মনে হইল—"সে অনিম্ন অভ্যাসের দর্শন বদ্ধ হয় তাহ। তো আমার জানাই আচে, উত্তেজনায় মুল।' এই উত্তেজনার কেন হয়, উহার গোসাইর কথা জানিতে ভোগে ভরে বিলাস, ‘অনিম্ন তো কতই হয়! দর্শন বদ্ধ হবার মূল কি তা তো রুদ্রি না।’

গোসাই। অনেক প্রকারের অনিম্নমে ওপর হয়ে থাকে। আহারাদির অনিম্নমে দর্শন বদ্ধ হয়।

আমি। নাছ নাং কখনও খাই না। উচিত বাণীরও তা সত্যাবাদন নাই।

গোসাই। তা বলুল কি হয়! কারও আকাঙ্ক্ষার বস্ত্র, লোকের বস্ত্র, তাকে না দিয়ে থেকে অনিম্ন হয়। (কোনও কোনও অভ্যাসীর বিন্যাসের সঙ্গে এক অসনে বসে আহার করলেও অনিম্ন হয়; এমন কি, একসঙ্গে বসে থেকে অনিম্ন হয়।

আহারের বস্ত্রে তমোগুণীর দৃষ্টি পড়লেও ক্ষতি হয়। এসব বিষয়ে যখন দৃষ্টিটি খুলে থাকে, পরিকারের দেখতে পাই মোসব লোকের দৃষ্টিতে আহারের বস্ত্রে কীটালু ব্যাপিয়া পড়ে। এসকল পূর্বে তো কিছুই বুঝতে পারিত না, মান্তামও না। কিন্তু প্রতিক্ষা হলে আমার অবিশ্বাস করি কিরূপে? আহারের বস্ত্রে লোকের সংস্পর্শে ও দৃষ্টিতে বিশেষ অপকর করে। দর্শন বদ্ধ করে।
আহার করা এখনও অনেক তাক্তিকে নিয়ম আছে। এজন্য দেবতার ভোগের দরজা বক্ষ করে দেওয়া হয়। তেমনো একটি ব্যক্তির দৃষ্টি আহারে পড়লে উহা ভোগে লাগে না, নষ্ট হয়। এজন্য দরজা বন্ধ করে ভোগ প্রাপ্ত করার নিয়ম আছে। ভাবের দৃষ্টিকোন দৃষ্টিপথ বন্ধ আহার করলে কাজ হয়; দেবতাকে দিলেও অপরাধ হয়। আহারের দোহল অনেক প্রকার উৎপাদনের স্থান হয়, তথে সমস্ত রিপুর উদেশ্যে। জানো। এইজন্য এ সব বিস্ময়গুলো সত্য থাকতে হয়।

আমি। অজ্ঞাত বন্ধ পরিসংখ্যান না জেনে ইত্যাদিতে করলে আমার অপরাধ হবে না? আর তাতে ইত্যাদি কোনও কাঠিন্য হবে না?

গোসাই। না, কোন কাঠিন্য হয় না। কারণ উহা তো ব্যবহার। তুলার না করলে যে রক্ষা পাওয়া নাই। ইত্যাদিতেও কোন কাঠিন্য হয় না। যথাযথ নিয়ম করলে ইত্যাদিতে জানতে পাওয়ান, সত্য হয়। ওতে কোন দিকেই অনিষ্ঠ হয় না।

আমি। ইত্যাদিতের কুপায় আমারের বন্ধ শোধিত হলেও তো আমার দুঃখ হইতে পাবে; এতিয়া প্রতি গ্রাস নিয়েন করে থাকি। উজ্জয়ি বল পুনঃপুনঃ নিয়েন করায় ইত্যাদির অনিষ্ঠ হয় না?

গোসাই। না, কিছুই না। ঐ রকমই করতে হয়। এজন্য আমারের সময় অনেক ভোগ কোথায় বলন না, মৌন থাকেন। দেশে এখনও তাক্তিকের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। পুরুষের ধর্মিণ এসব কুপ আবশ্যক রুক্ষর ছিলেন; তাই আমাদের হিতের জন্য শায়ারাদিতে লিখে রেখে গেছেন। (বস্তু তবাতে তারা যে সকল মহাস্ত অভ্যাস বিষয় অবিনাশ করেছিলেন, তার তত্ত্ব অবরল না হয়ে, একেবারে কৃষ্ণকার বলে উড়োরে দেওয়া ঠিক নয়।) ঋষিরা যাতে বলে প্রতাক্ষ করেছিলেন তাই আমাদের কল্যাণের জন্যই রেখে গেছেন, যিন্দ্ব কথা কতকগুলো লিখে রাখার তাদের তা কোনও স্বাধীন ছিল না। আমরা প্রকৃত ধর্ম লাভ করি, এই উদ্দেশ্যেই তারা শায়ারাদি লিখে গেছেন। যা সত্য বুঝ তাই এখন করে যাও। সকল নিয়ম এখনই প্রতিপালন করতে পারবে না?
না; সাধ্যমত যতটুকু পার, ক’রে যাও; তাতেই ঠের উপকার পাবে। সকল নিয়ম রক্ষা ক’রে চলা যদি সহজ হ’ত, তা হ’লে তো অনায়াসে সকলেই সিদ্ধি লাভ করতে পারত। আহারটি সর্বশেষ ভজন। গোসাইমত আহার করতে পারলে তাতেই সুব হয়, আর কিছু করতে হয় না। তা তে কেহ কিছু করে না, আর না। আহার বিষয়ে নানা প্রকার, অনিয়ম চলছে, তাতে বড় অনিষ্ট হচ্ছে। এখন যা পার ক’রে যাও। ক্রমে সবই জানলে, করতেও পারবে।

চরণামৃত্তলভ ও তত্ত্বিয়ে উপদেশ।

আমার বোগ অত্যন্ত বাড়িয়া পড়িয়াছে; কুলও ছুট হইল। বাড়ি যাতে প্রকৃত ছন্দে আঘন, হইল। বাড়ির নামে আমার সৎবা উপস্থিত হয়। গোসাই ১২৯৩; সংকল্প। মহাশয়ের সঙ্গহইতে তদান থাকিয়া, আপন পড়িলে কি প্রকারে রক্ষা পাইব ভাবিয়া সন্ত হইলাম।’ শাক্তের বড়ুদী মহাশয় বলিয়াছিলেন— গোসাই'র চরণামৃত গ্রহণের করিবে শারীরিক ও মানসিক বিকারের শান্তি হয়। আমি ইহার কিছুই বুঝি না, তবে বড়ুদী মহাশয় বড়ুদী খাটা লোক, তাহাকে খুব বিচর্ণ করি। তাহ, ভবিষ্যতে বিষয় উৎপাতের ভয়ে, উহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া আমার একুশ্চি হইল। আমি গোসাই মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখি ধরন্তরা লোক; নির্দোয়ে চরণা পাওয়ার আকাশ। মনে মনে গোসাইকে জানাইলাম। তিনি একট পরেই গোসাই করিবার জন্য বাহিরে গেলেন। আমি সেই স্থানে গিয়া বার্ষিক দাজ্জাইলাম। গোসাই আমার নিকটে আসিয়া আসিয়া মতে গোসাইকে জানাইলাম। প্রণাম করিলাম, আমার বেন কুকুরে— সত্যবুদ্ধিতে নিষ্টা হয়। ও বুদ্ধি আমি না। চরণামৃতের দিয়া গোসাই বলিলেন— ইহার যত গোপনে ব্যবহার করবে, ততই উপকার পাবে। লোকের সামনে গ্রহণ ক’রে না, আর কাহাকেও জানতে দিও না।

বারদির ব্রহ্মচারীর সঙ্গ; মহাপুরুষের বিচিত্র উপদেশ ও অসাধারণ আচরণ।

বাড়িতে আসিয়া কিছু দিন বেশ কাটাইলাম। পরে না। দিকৃত হইল নানারূপ উৎপাতের আগ্রহের। অবশেষে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। উপস্থিতে একবার এলাকায় চিঠকে বয় সংগঠ, ১২৯৫। বিষয় বিক্ষিপ্ত ও প্রলুক করিয়া দেয়াল। তাবিলাম, এবারে আমর রঙ্কা নাট্য, নিশ্চয়ই ব্যুঝাচারে গা চালিয়া ব্যবহারে গ্রহিত হইতে হইবে। এই দিনেই আমি
চক্রচকিতের আশঙ্কা করিয়ে লাগিলাম। দিবসের কুচিত রাত্রিতে কলাবায় মুঁড়িমান হইয়া আমাকে অহিস্ত করিয়ে লাগিল। শরীর পূর্বাঞ্চলে আরও নিদ্রাবন্ধ হইয়া পড়িল। পড়াশুনে একক্ষণ তাগই করিলাম। পরীক্ষার মুহূর্তে হতাশ হইলাম। সাদৃশ্য ভঙ্গে চড়ি উদাসীন হইয়া উঠিল। দিবানিধি আমার লাগাটেপিতে নিবিড় নীল আকাশে নিয়ত যে সূর্যমণ্ডল দর্শন হইত, ধীরে ধীরে উঠে মেঘমণ্ডল হইয়া, অস্থির হইয়া গেল। আমি অহিমিতির হতাশ করিয়ে কাটাইলে লাগিলাম। কুচিষ্টার ফল হাতে হাতে পাইলাও ছাড়িতে পারিলাম না। নিরুপয় হইয়া তখন সময় অবধি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের লিপিয়া জানিলাম। তিনি মহতে গন্তের উভয় দিলেন—

"নির্ক্ষার ভুল! মনে খাঁচাপ হলে এখানে এদের উপরে নিয়ে বাইসাঁ—নেদনা। অল্প হলে সব মাটি বুকে ডিলসম—কেন বলে যে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। পিয়াল জুতা পরিস—না, নীচনিবাসণে সাধারণ। সব আপদ দূর হবে, কোন ভয় নাই। আজ—ব্রহ্মচারী।"

পরখানে পাইলাম ব্রহ্মচারীকে দেখিয়ে প্রবল আকাশে জয়লাম। পাহাড় মমি অগ্নিতের একটি আগেকে সকল পাইলা বাড়ির রাঙ্গা হইলাম। সকাল বেলা হইতে তা পর্যন্ত ইটিয়া ব্রহ্মচারীর নিকট দুঃখিলাম। ব্রহ্মচারী প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার পত্র পেয়েছিলো?" আমি বলিলাম—"হৈ।" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"আজ কি থেকেছিলো?" আমি—"কিছু না।" শুনিয়াই ব্রহ্মচারী মহাশয় তখন বলিলেন—মজেরাম কে ডাকিয়া কহিলেন—"ওগো, আজ যে নাড়ু অগ্নিতে করিয়ে দেব নিয়ে এল।"

শেষমেয়া সেবিকা তৎক্ষণাং খালাভরা নাড়ু নিয়ন্ত্রিত ব্রহ্মচারীর সমক্ষে রাখিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে বলিলেন—"এখানে নিয়ে যা।" আমার সঙ্গে গৃহস্থানীতেও অমৃণ্ড করিলেন। তিনি বলিলেন—"আমার প্রসাদ হলে খেতে পারি।" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"প্রসাদ কি? ইচ্ছা হইলে খেতে পার।" আমি গৃহস্থানীতে বলিলাম—"উনি যখন দিলেছেন তখনই প্রসাদ হয়েছে। নিনা?" গৃহস্থানী একটি বিষয়াতঃ করিয়ে দেখিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আমাকেই সহগুলি খাইতে বলিলেন। সেবিকা নাড়ুর খালা রাজারের লাইয়া গিয়া আমাকে আসন পাড়িয়া বসিয়ে দিল; এবং ব্রহ্মচারীর সদস্য মন্ত্রে নাড়ুগুলি খাইবার জন্য আমাকে জেদ করিয়ে লাগিল। আমি বিষম মুক্তিসেবিকা পড়িলাম। এক থাবা ভাল আমার পুর আহার; অর্থদেরের অধিক পরিমাণ এই নাড়।
আমি জানি কি প্রকারে৷ বিশেষতঃ পিত্তশুল বেদনায় নাড়ু বিষমতা৷ যাহার হয়ক, ক্ষুদ্র-চারীর আঁধাস্বরূপে মনে করিয়া সমতুলী নাড়ুই থাকিলাম৷ ভজ্ঞরাম কহিল—”বাবা আজ মধ্যাহ্নে৷ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন একটি ছেলে অনাহারে খুব পরিশ্রম হয়ে আসছে৷ উত্তরে নাড়ু বেশী পরিমাণে প্রস্তুত করে রাখু৷ সে এলে খেতে দিব৷”

আহারে ব্যক্তিবরূপে নিকটে গিয়া বসিলাম৷ মিলিয়া মিলিয়া অনেকক্ষণ দাত করিলেন৷ অপরাহ্ণে এটার সময়ে ব্যক্তিবরূপে আহারে একটি হইল৷ আহারের পর তিনি আমাকে অসাধ্য পাইতে বলিলেন৷ আমি বলিল—”এইমত রাশীরুদ্ধ নাড়ু খেয়েছি৷ এত খাবার বহুকাল খাই নাই৷ এখন আবার খাব কি রূপে৷” ব্যক্তিবরূপে বলিলেন—”খেতে বসু না গিয়ে, বর্ধন পাবে এক্ষণ৷” আমি আর প্রতিবাদ না করিয়া আহার করিতে বসিলাম৷ আছি নাগার রূপ৷ প্রায় সেই চম্পকার গঙ্গে আমার লোভ হইল, ফুল পালিল৷ বচির সহিত নিবিড় আহারের৷ প্রায় চঠুগুল থাইলাম৷ রাত্রে ব্যক্তিবরূপে সেই সময়ে রামায়ণে আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল৷ গভীর রাত্রিতে হঠাৎ নিজীভূত হওয়ায় গিলন ব্যক্তিবরূপে মহাশয় ভজন গাঁথিতেছেন—”গোরঞ্জ, গোরঞ্জ, নিজনা৷ জীবনকর্মা৷ জীবনকর্মা৷” গাচ্ছিল গাচ্ছিল তিনি কাদিতে লাগিলেন৷ সকাল বেলা উঠিয়া প্রতিষ্ঠিতি সমাপনাদে ব্যক্তিবরূপে মহাশয়ের নিকটে গিয়া বসিলাম৷ তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—”ওরে, তোর কিছু বলো আকুলে এখন বল৷”

আমি। কানের অসংখ্য বলায় আমি বড় অষ্টে হতে চাই। কি করুন৷
ব্যক্তিবরূপে। কেন, রমণ করবি৷ তোর কি ঝুঁটে না৷
আমি। ডের ঝুঁটী; কিন্তু তাতে যে পাগ হয়৷
ব্যক্তিবরূপে। আচ্ছা, দি৷ তোকে কোন পাপ স্পষ্ট বলবে না৷ সব পাপ আমার৷
আমি। লোকে যে নিন্দা করবে৷
ব্যক্তিবরূপে। কে নিন্দা করবে৷ জানিন্দা নিন্দা করবে না—মুরক্ষুরাই করবে৷
মুরক্ষুর নিন্দার কি হয়৷
আমি। জানিন্দা নিন্দা করবে না কেন৷ সকলকেই তা এই কাজের নিন্দা করে।
ব্যক্তিবরূপে। দুইবাবলের দুইবাবলের একটি ছেলে যখন দোষিত তে তা দেখেছিল৷
১৮১০ হতে দোষিতে গিয়ে হৃদয় করে আছি খেয়ে পড়ে৷ আবার উঠে। ২৫ বৎসরের
একটি যুবক বর্গ সেই শিশুর উত্তর পড়া দেখে হাসে৷ ঠাই করে, তাকে কি বলব৷

* ব্যক্তিবরূপে মহাশয় গোসাইকে চিরকাল “ভীষনককৃত” বলিয়া ডাকিতেন৷
আগ্রাহায়ন।]  
প্রথম পাখু।  

সে শালা মুক্ত না? সে জানে না যে কত উঠা পড়া করে এখন তার ঘাড়কে জোয় হয়েছে, সে টুকোশ দোঁড়িতে পাড়ে। শিশুর উঠা পড়ায় কি জানিনা লিনা। করে? কত আছাড় খেয়ে, পড়ে উঠে, তবে বলবান হয়—জানিনা তা জানে।

আমি। আছি, আমি তা হ'লে আপনার উপদেশমতই গিয়ে চলি, নিরুত্তির কথা তো। আর আপনি বলছেন না?

ব্রহ্মচারী। "আমি তোকে নিন্দিতির কথা বলব কেন? তোর করেই তোকে নির্দোষ করবে। আমি উৎসাহ দিলেই কি তোর সাথে আছে যে তুই করতে পারিস? ইট জেনেই তোকে বলছি। তুই গিয়ে দেখো। এখন ধর্ম ধর্ম ক'বে অগ্নির হইসে না। কষ্টের না করলে কিছুতেই কিছু হবে না। এখন গিয়ে বেসা পড়া কর, আরো শেষ কর। ধর্ম পরে লাভ হবে। আমি আরও একসব বৎসর আছি; শুধু তোদেরই জ্যেষ্ঠ, আমার আর বিন্ম প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী আমাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। আমি বলিলাম—এখন আমার যাইতেই ইচ্ছা নাই; কিছুদিন আপনার নিকটে থাকতে ইচ্ছা হয়। ব্রহ্মচারী—তা বেশ, থাকতে পারিস থাক; তোর কথাই তোকে টেনে নিবে। এই বলিয়া তিনি গোসাইকের কথা তুলিলেন, বলিলেন—"গোসাই দেশবিদেশে আমাকে মহাপুরুষ বলে প্রচার ক'বে আমার সক্ষম করলে।" ১২ বৎসর কাল আমি এখানে বেশ ছিলাম; এখন রোগীর তীক্ষ্ণ আর মামলা মোক্ষণার কথা উদযাপন আমি ভুলি। এই জীবন কি আমি এখানে আছি? শালা অক্ষ, মুক্ত। কচি-কচি ছেলেগুলোকে ঘোষণা নিচে আর বলে 'পুরমহসজ্জী পরমহসজ্জী'।" এইপ্রকার নানা কথা গোসাইকে বলিয়া, আমাদের সাথের কূলিতে করিতে লাগিলেন। আমি সেসব কথা শুনিয়া কাঠিয়া ফেলিলাম; তখনই চলিয়া আসিতে প্রস্তুত হইলাম। ব্রহ্মচারীর কথায় অগ্রগণ্য আহারাক্ষে বেলা ১২টার পর ঢাকায় রওনা হইলাম।

ব্রহ্মচারীর সঙ্গ মানা।

গেণ্ডারিয়ার আম গাছের নীচে গোসাইকে নিজেদের পাইল ব্রহ্মচারীর বিষয় সমস্ত কথা বলিলাম। গোসাইমী মহাশয় শুনিয়া বলিলেন—

এখন তোমাদের যে কেহ ব্রহ্মচারীর নিকটে যাবেন, তাকেই তিনি একবার 'নাড়া-চাঁদা' করবেন। আমাকে তিনি আকলে ক'বে বললেছিলেন—"মুনি-খাসীদের 'কলজে' তুই শেয়াল কুকুরগুলোকে বিলাচিলাম!" আমি বললাম, যেমনু
পুরমহূঁসজ্জি আদেশ করেন তেমনি আমি করছি। তিনি বললেন—“আচ্ছা, আমি
একবার বেশ করে দেখব!” তাই এখন তিনি আরস্ত করেছেন। এতে
তোমাদের আর কি? আমাকেই পরীক্ষা করছেন! তিনি বলেছিলেন—তের
‘নাজি-বিুঁড়ি’ আমি টেনে বের করব। এখন তিনি তাই করছেন। যত পারেন
করুন। তবে, তোমরা এখন কেমন সেখানে গেলে কষ্টকর হবে। একপ্রকার
সকলকেই বলে দেওয়া ভাল।

গোসাই মহাশয়ের একটা আমাদের সকলের ভিতরেই চারিত হইল। প্রায় সকলেই
অত্যন্ত প্রস্তুত নিকটে বাহারিত ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু, বাড়ীর প্রধান
মহাশয়ের নিকটে বাহারিত বদ্ধ করিলেন না, দুরহার আর কাল মধ্যে এমনকি হইয়া—লাভ—ভক্ত
পরিতাপ পূর্বক, বিষয় হুমকিপথে হইয়া পড়িলেন।

বড় দাদার অঘটিত দীক্ষালাভে আমার আক্ষেপ।

ঠাকুরের সাহসিনা দান।

বড় দাদার নিকটচহতে একখানা পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—
২৩-২৬শে “দৈক্ষ লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল অবস্থায় গোসাই মহাশয়ের কুলের
অধ্যাপক। উপর তাহারা আপনি করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে একদিন শ্রীমুক্ত রামানন্দ
মানী ( রামকুমার মিত্রভক্ত, ব্যাধিশ্রমণ্ডল মহাশয় ) হঠাৎ ফরজাবাদে আসিয়া আমাকে
পূর্বক কিছু গস্তে না বলিয়া, পাঁচটা ঘণ্টা বেড়াইতে নিয় গেলেন। সেখানে তিনি নামধার
অতিশয় অনিচ্ছায় কানে নাম দিয়া বলিলেন,—‘আমি তোমাকে দীক্ষা দিলাম। এই নাম জপ
কর।” আমি ইহু দৈববিন্দুক ভাবিয়া, দীক্ষা বলিয়াই মানিয়া নিত্য ছি; এবং নিয়মত জপ
করিতেছি, উপকার ও পাইতেছি।”

দাদার পরতার পাইলা মাথা ঘুরিয়া গেল। প্রাণে অক্ষর যাতনা হইতে লাগিল।
আমি অবগত শুনে গোসাই মহাশয়ের নিকটে পৌছিয়া পত্রপ্রাপ্ত। তাহার হাতে দিলাম। তিনি
ইহু সত্য একটু স্বাধীনতা আমাকে বলিলেন,—এ তো বেশ হয়েছে! যাক, হংসীত
গেল। ভগবান কত প্রকারেই লোকের মঙ্গল করেন।

আমি। আগন্তুকে আশা দিয়া দাদাকে একটু জানালে বোধ হয় এক্ষণে হইত না।

গোসাই। কেন? এ মন্দ কি হয়েছে? সংশয়মূলক যা হয় তা কি কখন
মন্দ হইতে পারে? এ ত ভালই হয়েছে।
আমি। তাকে যদি আপনি কুপা না করেন তা হ'লে হবে না। আমি একাই আপনার কুপা ভোগ করতে চাই না।

গোসাই। কেন? তাঁর কাজ তিনি করবেন, তোমার কাজ তুমি কর। যার যার কাজ তাঁর তাঁর কাজে।

আমি ইহার পর আর কিছু না বলিয়া কঠিনতে লাগিলাম। পুনঃ পুনঃ মনে মনে গোসাইকে প্রশ্ন করিয়া, প্রথমে করিতে লাগিলাম—'দাদাকে যদি দয়া করিয়া। অচিরে টানিয়া না আনেন তাহা হইলে আমারও কিছুই প্রয়োজন নাই। দাদাকে চাঁদিয়া মুক্তিলাভেও আমার আকাজ নাই।' গোসাই আমার পাণে একটি সময় তাকাইয়া থাকিয়া চোখ বুজিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবেশ অবসান হইয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—একটি রৌদ্র গাছের শিকড়ের সহিত কোনও বস্তু মিলায়ে রোগীকে উত্থান দিয়ে গাইলেন। মোহনী আরোপী হয়। মোহনী উত্থাত মধ্যে মাত্র শিকড়টাই দেখে; অন্য বস্তু দেখে না। একবার ভাবল, 'এ ত শিকড়েরই মুখ।' তিনি বস্তুটি বাদ দিয়ে একটি রোগীকে সেই শিকড় মাত্র সেবন করতে দিলেন। সুতরাং রোগের আরোগ্য নাই। ইত্যাদি।

কিছু পরে আবার বলিতে লাগিলেন—এক নায়ক ধানগাছ জমাবে স্থির করলে। অক্ষরে একটি উর্দ্ববর্ণ তুমি পেয়ে মনে করলে চাইয়া। অনুর্ধুর। অপরিকাঠ তুমিতে ধান ছড়াইয়া। রাখে, তাই কেবল মুর্দার ধানর হয়। আমি এই সুন্দর তুমিতে ধান বুনিতে দিব না; যেমন সুন্দর সার মাটি তেমনি সুন্দর ধানের সার বুনে। সে তুষ ফেলে চাল বুনুল। ধান বুনুল অক্ষর সুন্দর কসল জমায়। চালে তা কিছু হবে না। ইত্যাদি।

অন্যদিকে এই প্রকার আরও অনেক কথা বলিলেন। পরিষ্কার বুনিতে পারিলাম না। বুলিয়া লিখিলাম না। এই সময়ে গোশামী মহাশয়ের চক্ষু দিয়া খুব জল পড়িতে লাগিল। কিছুকাল পরে চোখ মুছিয়া, মাথা তুলিয়া, আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—তোমার চিকির্ষিত হবার কোনও কারণ নাই। তাকে আমার নিকটেই আসতে হবে। এই সাধনে ফল পাওয়া না; তুষ্পি ও লালভ করবেন না। এখন সাময়িক একটু শান্তি পেতে পারেন। এখন তুমি ঐ সাধনেই করুন; ওতে বেশ শিক্ষা।
হবে। পরে আজ সময়েই বেশ ফল পাবেন। তুমি কখনও তাকে নিরঙ্কে করে না। খুব উৎসাহ দিয়ে পত্র লিখ।

আমি। দাদার আসতে হবে, তবে অনেকটা সময় নষ্ট হল।

গোলার। না, এ নষ্ট নয়। এতে তার উপকারই হবে। আর এ ঘটনায় তোমারও খুব উপকার হবে। তা তুমি শীঘ্রই জানতে পারবে। নির্দিষ্ট সময়টি অতীত হ'লেই বুঝে, এ ঘটনায় তোমার দাদারও কত উপকার হয়।

বিদায়র্পণ মহাশয় দাদাকে দীক্ষা দিয়া সময় নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন--'হয় মাতে তুমি সিদ্ধ হইবে।'

একমাসে সিদ্ধিলাভের উপায় নির্দেশ।

খুব অল্প সময়েই সিদ্ধাবস্থা লাভ, কৃষিরাখে একটি প্রণালী আজ ওরদের আমারিতে বলিয়া দিলেন। একমাসকাল কেহ বাবহার্যতা নিম্নে৷ অদিকা নির্দিষ্ট প্রণালী অমৃতকাল সাধন করিলে মিলিয়াই তিনি সিদ্ধলাভ করিবেন। লীলা দেহাট্টাব ১২৯৫ এপ্রিল, ২৭শে এপ্রিল, ১২৯২ মায়ান; হইবে, যদি কাহারও প্রাণে এইকক আশাক হই, সিদ্ধিলাভের পূর্বেই দেহাট্টা হইতে পারে বলিয়া যদি কাহারও অন্তরে আক্ষরে আসে, অনায়াসে তিনি ইচ্ছা করিলে একমাসকাল নিয়মে বাকি। এই প্রণালী ধরিয়া সাধন করিতে পারেন; সিদ্ধলাভ করিবেন। নিয়মগুলি অত্যন্ত সহজ বলিয়া, কাহারও ওরদের জেদ করিলে না, "বাহার ইচ্ছা হয় এই মত সাধনে রঘুত্তে পারেন " ইহাই মাতে বলিলেন। নিয়মগুলি এই--

১। লোকসঙ্গত্যাগ। বিশেষতঃ শ্রীলোকের দর্শন, স্পর্শন, তাহাদের সম্বন্ধে শ্রবণ ও চিন্তার সম্পূর্ণাং বর্জনীয়।

২। নির্জননে শুচিগুহ্যত্বের দিবসে একবারমাত্র স্পৃক্ত আত্মপান-আহার।

৩। শয্যন্ত্যাগ। অত্যন্ত অবসাদ বোধ হইলে নিতান্ত আবস্থকায়, বাহুমাত্র উপাধানে তৃপ্তি স্থাপন।

বাহিরে এইসকল নিয়ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে, নির্দিষ্ট প্রাক্তে মূর্ধন্য এবং অন্যান্য সিদ্ধান্তে উপরেরন্তর্বর্ক প্রাপ্যপ্রাপ্ত, কৃষি কল্যাঞ্চষে প্রণালীকৃত নামসাধন করিতে হইবে।
এই প্রকার নিয়ম অবলম্বন করিয়া, একমাত্রকেই কেহ সাধন করিলে, নিশ্চয়ই তিনি সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবেন। অন্ততঃ তিনটি দিন যদি কেহ করেন, তিনি সাধারণের দূর্লভ কোনো একটি বিশেষ অবস্থা লাভ করিবেন, ইহাতে আর কোনো সংশয় নাই।

মুদ্রাটি দেখাইয়া বলিলেন—এই প্রকার মুদ্রাবস্থা করে আসনে বসা অভ্যস্ত হ’লে কামকোথায় রিপুগণ নিষেধ হয়; শরীর রসসূত, সাধনপথ্যগী সবল ও সুস্বচ্ছ হয়ে থাকে।

গেওঝারিয়া-আশ্রমে ঠাকুরের কুটীর।

গেওঝারিয়া-আশ্রম সকারের কিছুদিন পরেই গোমানী মহাশয়ের আসনকুটীর নির্মিত হয়। গোমানীর শিক্ষা ও জীবনের গৌরব মহাশয় ইহা প্রশস্ত করাইয়া দেন। আশ্রমের উত্তর-পূর্ব কোণে, ৮ হাত অন্তরে ঐ ঘরটি অবস্থিত।

ছোট কুটীরখানা দক্ষিণ-পশ্চিমে লগ। দৈর্ঘ্যে ১০ হাত, প্রস্থে ৮ হাত মাত্র। যুক্তিকার প্রাচীরে নির্মিত; চোখালা, ছন্দের (খড়ের) ছাঁটিতে আরুত। কুটীরের মার্গাধীণ দক্ষিণ-পশ্চিমে দেখা একটি দরজা এবং উত্তরের পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণের দেওয়ালে আড়াআড়ি ছোট ছাঁটি ছইট (১ ফুট গঠন ও ২ ফুট লম্বা আইয়ের গঠন)। কুটীরের দক্ষিণে ছইট প্রকোষ্ঠ। দরজার পূর্বদিকে বেড়া উত্তর-দক্ষিণে লগ, একটি উচ্চ প্রাচীর সমন্বয় দরজায় কিছুগুলি নির্মিত হইতে বিতৃত করিয়াছে। পূর্বদিকের গোপেকোষ্ঠের প্রবেশের একটিমাত্র ৪ ফুট লম্বা ২ ফুট গঠন চোকাটি হইৰের সরু পথ; উহা দিয়ে দেওয়ালের উত্তরদিকে রাখা হইয়াছে। এই প্রকোষ্ঠে বেলা হই গ্রহের সময়েও আলো প্রবেশ করে না; অন্ধকারমর। ইহাতে দক্ষিণের দেওয়াল সঞ্চল, উদ্ভবমুখে গোমানী মহাশয়ের আসন রহিয়াছে। সমুদ্রে মাত্র থুকু ঘর আর কিছুই নাই।

সাধারণতঃ, গোমানী মহাশয় পশ্চিমদিকের দরজায় এই বসিয়া থাকেন। পূর্বদিকের অন্ধকারমর কুঠিতে গোমানী মহাশয় পশ্চিম আসন কুঠিবার সজ্জা করিয়াছিলেন—আসন রচনার আয়োজনও হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ সে সন্ধ্যা তাগ করিলেন। শুনিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন যে—‘পশ্চিম মুখাসন করিয়া উহাতে একবার বসিলে, এই হাত তাগ করিয়া, অন্তত আর কোখাও যাওয়ার উপযোগ নাই। হলুদ উহাতে আর একবার নাই! ’ কিন্তু
শঙ্কুগোসন না করিলেও সিবরের কোন কোন নিদ্রিত সময় ধরিয়া ঐ আসনেই বসিতেন। গোসানী মহাশয়ের আগ্নেকুটীরের উত্তরদিকের দেওয়ালের বহিগতে প্রায়শঃ তিনি নির্দেশ অনিবার্ত তুষ্পরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম এবং আসনস্থলের ভিতরে ঐ দেওয়ালের গাত্রে কয়েকটি উপদেশ চক্ষুশ্রীর ধারায় লিখিয়া রাখিয়াছেন।

(ক) কুটারের উত্তর দেওয়ালের বহিগতে—

ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নমঃ।

(খ) কুটারের অভ্যন্তরে দেওয়ালের গাত্রে—

এইচা দিন নাহি রহেগা।

১। আত্মপ্রশংসা করিও না।

২। পরনিন্দা করিও না।

৩। অহিংসা পরমো ধর্মঃ।

৪। সর্বজীবে দয়া কর।

৫। শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর।

৬। শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলিবে না তাহা বিবৎ ত্যাগ কর।

৭। নাহৎকারাৎ পরে। রিপুঃ।
কটীর ছেলে দুর্দূরের বহিস্থান

(ন) পুরুষদের ভাবাদের মাঝে—

একটি নির্মল রসায়ন

৩. বিভিন্ন তাম্রপাক করান।

৪. পরিমিত করিয়া তুল।

৫. আধিপত্য প্রদান কর।

৬. সম্মুখে ব্যবহার কর।

৭. শুদ্ধ ও মহানমনস্ক নিহিত কর।

(ন) এ ও মহানেন্দ্রনের আচারের সুন্দর মাহা মিলিত হওয়া কস্তা বিস্বত তাস কর।

হা। অর্থ করিয়া পরে। রিপু।
সাধকের পক্ষে, প্রাত্যহিক প্রতিপালন বিধি।

আজ আমার সাধন-জীবনের তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইল। অপরাজে গোসাবর্ম-আশ্রমের মৌসুম, ১২৯৫; উপস্থিত হইলাম। গোসাবর্ম মহাশয় সমাধিস্থ রহিয়াছেন, দেখিলাম সরি চল। একেকটি লোকরা তাহার সম্ভুত স্রষ্টার উপরিভাগ আছেন। কিছুক্ষণ পরে গোসাবর্ম মহাশয়ের বাহ্যকৃতি হইল। তিনি ধীরে ধীরে আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন—প্রাণায়মের কাজ তোমাদের প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি নিয়ম রক্ষা ক'রে চলতে চেষ্টা করবে।

১। ক্রিয়া, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যাম—এই পঞ্চভূতে প্রণালীমত দৃষ্টিকোন সংখ্যক অভাগা করবে।

২। ক্রিয়া—আবার উদ্যোগের শাসনী। চিন্তা প্রশাসন। সর্বদা রক্ষা ক'রে চলবে।

৩। দম—ইন্দ্রের বিত্তহরতে যেসমস্ত কুঃঅভাগা জনৈক, তা হতে মনন্তকে নিরুপন রাখবে।

৪। তিতিক্সা—সকল প্রাকার ছাড়ের অবস্থায়ই ক্ষমা, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করবে।

৫। উপরিতি—মৃত্যু ও পরলোক-চিন্তা করবে। দেহ, বিষয়, সাঙ্গসার সমস্তই অনিয়ম অসার—প্রতিদিন ভাববে।

৬। ধর্মপদাতিতা—মুখ ছাড়া, মান অপমান, নিন্দা প্রশংসা-সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থাতেও চিন্তার অবস্থা অবিচ্ছিন্ন, একই প্রাকার স্রষ্টার রাখতে চেষ্টা করবে।

৭। প্রাণায়ম—ঋতুপ্রাপ্তি প্রথম-পাঠ। মহাভারতের মোক্ষ-পক্ষ, শ্রীমদভাগবতপুরীতা—এসবহতে অস্ত্রতা হ'থেকে একটি পোকা একটি পাঠ করবে।

৮। তাত্ত্বক—প্রত্যায় সাধ-দর্শন বা ধর্ম-বিষয়ে একটি আলোচনা করবে।

৯। দান—যার যেরূপ সাধন, অন্ততঃ একটি সংকল্পও, দান করবে।

১০। তপস্যা—সাধন, যা ক'রে থাক।

প্রতিদিনই এ সকল নিয়ম রক্ষা করতে চেষ্টা করবে।
দীপক এইসকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলা তো আমার পক্ষে একবারেই অসম্ভব মনে হয়। প্রতিদিন এ-নিয়মগুলি অন্ততঃ দেন একবার ঘনরাগ করিয়া পারি, এই অশীর্ষ্মা প্রার্থনা করিয়া গুরুদেবকে আগাম করিয়া। কীভাবেও আজ সাধ্য প্রায় স্তার সময় বাসায় আসিয়া মনে করিয়াই।

কলের পড়াত্যাগ ও পশ্চিমে যাওয়ার আদেশ।
ধ্যান ও আসনের উপদেশ।

কিরুকালগাথা আমার বেদনা-রোগ অনিয়ম বৃদ্ধি পাইয়াছে। দিন রাত অবিশ্বাস্ত পড়া হয়না, আর আমি সহ করিতে পারিতেছি না। প্রতীক বিষয় হরষ্ট দেখিয়া, শ্রীমান হৃদয়কার বিষয়ের মহাশয় আমাকে পড়া-তত্ত্বাত্মক ছাড়াই পশ্চিমে যাইতে বলিতেন।

পাদাঙ্গনায়, আমারও একবারেই উপযোগ নাই। কিন্তু বহুকাল বাড়তি মধ্যে কিছু নাই যাবৎ আমার লেখাপড়া আরম্ভ করিয়াছি। অপর এক পদ্ধতি করিয়া দাদার কি বলিবেন—সর্বদা ইহাই মনে হইতেছে। আজ অক্ষর বড় দাদার একটা পদ আসিয়া পড়িল। বিধাতা মহাশয় দাদার গুলো জানি না, তিনি আমার সহজে দাদাকে কি বলিয়াছেন। বিধাতা মহাশয়ের কথা উলেখ করিয়া, দাদা আমাকে লেখাপড়া বন্ধ করিয়া অবিলেখে পশ্চিমে যাইতে লিখিয়াছেন। আমার বর্তমান হরষ্ট ভাবানুর আশীর্য সকল বহস্ত দেখিয়া আমি একবারের অবক্ষ হইলাম।

বিধাতা মহাশয়ের কথা দাদার লেখাপড়ার সংবাদ জনিয়া, মনে বড়ই দূর্দশা পাইয়াছিলাম; গোষ্ঠী মহাশয় তখনই আমাকে বলিয়াছিলেন—‘এতে যেতে খুব কল্যাণ হবে। তো তুমি শীঘ্রই জানতে পারবে।’ গুরুদেবের এই কথা পুনঃ পুনঃ এখন ঘনরাগ হওয়ায়, আমার সংশয়পূর্ণ অবিশ্বাস্ত চিন্তকালে তাহার শত্রুশ্রম শীঘ্রতে সংলগ্ন করিয়া দিতেছে। গুরুদেবের শীঘ্রতন্ত্রে বারংবার প্রাপ্তিপূর্বক প্রার্থনা করিলাম। হৃদয় মধুর, এবারেই দেন চিন্তকালের মত লেখাপড়ার অলঙ্কার দিয়া, শুল-কারাগারহইতে উমার পাইতে পারি এবং তোমার সঙ্গ সত্ত্ব লাভ করিতে পারি, ইহাই করিও।'

দাদার পত্র পাইয়া অর্থ দিলাম মধ্যেই লেখাপড়ার পৃষ্ঠপ�োকলি গুছাইয়া। অটী বাধিয়া দেখিলাম; বাসার সকল শুল কলেজে যাওয়ার উদ্যোগ করিয়া লাগিল, আমি পশ্চিমে যাওয়ার অন্তর্ভুক্তির জন্য গোষ্ঠীর মহাশয়ের নিকটে চলিলাম। শাস্ত্রীয় পন্ডিত মহাশয় পথে পাইয়া সংশয়ে গোষ্ঠী মহাশয়ের দর্শনতাতে সহজ
গৌণ।

প্রথম খণ্ড।

কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন—“দীন রাত্রি আজকাল তিনি ভাগনের ঘরে বস্ত থাকেন। পঞ্চমৌসনে একমাস কাল বিলম্ব অতি তীব্র কঠোর সাধন করিয়েন। এই সময়ের মধ্যে বাহিরের লোকে তাহার দর্শন বড় পাইবেন না। সাধনের ভিতরে তাহারা আছেন তাহারাও নির্দিষ্ট সময়েই মাত্র দেখা পাইবেন।” জিজ্ঞাসা করিয়া—

গৌসাইয়ের আবার পঞ্চমৌসনে সাধন করিবার এরূপ কি তোমার পত্তিত মহাশয় বলিলেন—“তিনি বলিয়াছেন, পরমহংসজ্ঞির আদেশ।” গৌসাই মহাশয় এখান সর্দারেই এখন সমাধিস্থ থাকেন। পঞ্চমৌসন সিদ্ধ হইলে, পাঞ্চটি পরলোকগত মহাশয়। গৌসাই তার প্রমাণ নিবিড় শক্তির লক্ষ্যে যুক্ত থাকিবেন, ঐসকল অম্মা সকলগুলি তাহার বিপদে ও অপ্রাকৃতিক দুর্বলতা। হৃদয় হইতে দেহাকে রক্ষা করিয়ে। বক্সী দাড়ির জন্য। গৌরিনা বিহিত হইলাম। গৌসাই এই অভ্যন্তর সাধনচেতা নায়ক শুক্রবার একে দেখানি করিলে বলিলেন। অন্যকারের গৌসাঈবক্তি গ্রহণ করিলে শিখিত অবগত আছেন। এসময়ে পরিকায়ারপে আমি অজ্ঞায়িত কোনো বলিলাম।

আমি গৌসাইয়ের দর্শন-প্রত্যাশা মনে মনে প্রভাবিত করিয়া গৌসাই মাত্রে উপবিষ্ট হইলাম। ৩০ মিনিট জঙ্গ-কুটিরের ক্ষেত্রে বসিতেই গৌসাই ঘরহইতে বাহিরে আসিলেন। দেখিতে আপনাহইতেই ডাকিয়া বলিলেন—তোমার শরীর তো খুব কাঁপে দেখি। এখন কি করবেন, স্থির করেছ? তাই কি করবে তোমার শরীর?

গৌসাই। হঁ। এখন তোমার পক্ষে তাই তো তো উচিত। এবার বুঝি পরিচয়। তা কি করবে তো শরীর খারাপ করে লেখাপড়াও তো। থিক নয়। আমি। এবারে যদি পরিক্ষা না দেই তা হইলে আর কখনও দিব না। এখন আপনি বলেন।

গৌসাই। স্কুলে পড়ে কি হবে? তুমিও যেমন! শরীরটি নতুন হলে পাখি দিয়ে কি করবে? বিচারলভর্য উদেশ্য; মোটি হ'লেই তো হ'লো। যত বড় বড় লোকের কথা শুন। যায়—মিল-প্রভূতি। সেন্নেই স্কুলে পড়েন নাই। স্কুলে যাতে বিচারলভর্য করা যায়; তুমিও তাই কর। স্কুলের পড়া তোমার পক্ষে স্ববিধার নয়। যাতে শরীর বস্তি নয়, স্কুলের পড়া তাদের পক্ষে আমি তো। তাল বনে করি না। আমাদের দেশে বেসবে ছেলেপিলের বায়ব দেখা যায়।
অধিকাংশই তোমাদের মনে পড়ে যে, আহার করে পরিশ্রম করতে মূখে খাবার দেয়া, তার উপরের পরিক্ষায় চিন্তায় মানুষ নষ্ট করে। এসব কারণে এত রোগ, এত অকালের। তুমি তোমার দাদার কাছে চলে যাও। সেখানে তোমার শরীরের মন সবই ভাল থাকবে। ওদিকে মধ্যে মধ্যে খুব ভাল ভাল লোকের দর্শনও পাবে। তোমার ভাই ভাল। একটি বিশ্বাস পর আমার বললে তোমার দাদাকে এই সাধনের ভিতরের কোন কথা বলে। না। ওসব বললে নিষেধ আছে। আর তাকে আমাদের সাধনের ভিতরে আবার কোন চেষ্টা করে না। তার জন্য তুমি কোন চেষ্টা করে। না। তার সময় হলে তিনি আসবেন। তোমার কোন চেষ্টারই দরকার নাই। আমাদের এ সাধন প্রচারের বস্তু নয়। যার প্রায় অসময়ই সময়মত তার নিকটে প্রচার করেন। এই বিশ্বাসের মহাশয় করেক্ট লোকের অনুষ্ঠানের কথা অতি সংক্ষেপে বলিলেন। তাহাদের নিজেদের মুখে সেবার কথার সময়ের হয়ে গেলে বিভক্তইতে পাড়ে। তাছাড়া বিভক্তির লিখিতার ইচ্ছা রহিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—রামকৃষ্ণের বাবু কি রকম? তিনি কি ব্রাহ্মসমাজের সাধনচাহী অথ কোন প্রকার সাধন করেন?

গৌরাঙ্গ। তার, তিনি অনু সাধন করেন। কিছু শক্তি পায় নাই। শক্তি পেলে গোপন করতে পারতেন না। তা প্রাকাশ হয়ে পড়ত।

আমি রামকৃষ্ণের বাবু সিদ্ধিন বলিলেন, "তোমাদের সাধনে কোন দেখিয়ে নাই, তবে বড় বেশী প্রাকাশ হ'লে পড়েছে, এই যা। সাধন গোপনেই রাখতে হয়।

গৌরাঙ্গ। তাতো ঠিক কথা; কিছু শক্তি গোপনেই থাকে না। আর সত্যের 'মানুষ' নাই। সত্যনিবাস প্রাকাশ করতে কাছে ভয়? সত্য যা তা নিশ্চয়ই প্রাকাশ পাবে। যুক্ত করে শক্তি পাবেন তখন দেখবেন উহা গোপনে থাকে না। রামকৃষ্ণের বাবুকে খুব বক্তা শরীর করে; তিনি ভাল লোক। আমাদের এ সাধনে সকলকেই ভক্তি করতে বলে। রামকৃষ্ণের সূত্র মত মন্ত্রকেও ভক্তি করবে। সকলকেই ভক্তির পায়। অবিচারে যিনি যত সকলকে ভক্তি করতে পারবেন তাই তত উপকার।

জিজ্ঞাসা করিলাম—সাধনের নূতন নিয়ম যা বলেছেন তা কি আমি করবো?
গোসাই। হা, তুমিও করবে, আসন এইরূপ ক'রে। আর এইখানে দৃষ্টি স্থির রেখে ধ্যান ক'রে। এই বিষয়, আসনটি করিয়া দেখাইলেন, এবং ধ্যানের স্থানটিও বলিয়া দিলেন।

আমি। ধ্যান কি? ধ্যান কাহাকে বলে? আমি বোঝে কিছুই জানিনা। কি ধ্যান করব?

গোসাই। তাছা, আসন ক'রে ব'সে ব'সে নাম ক'রে, আর চোখ বুকে দৃষ্টি এখানে স্থির রেখে। পরে আপনি সব জানতে পারবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—চোখ বুকে আবার ওখানে দৃষ্টি স্থির রাখন কি প্রকারে?

গোসাই। চোখ বোজা পাকবে, মনটিকে ঐখানে স্থির রাখবে।

আমি। কিছু না পেয়ে শুধু শুধু মন একটা স্থানে স্থির থাকবে?

গোসাই। হায়ামি করেলেই কিছুকাল পরে নানারকম জোটি ও রূপাণি দেখতে পাবে। মনটিকে একটা স্থানে এখন স্থির রাখতে চেষ্টা কর। পরে তোমার পক্ষে যা প্রয়োজন জানতে পারবে।

এরপর আসন বসা অভ্যাস হ'লে কি উপকার হয় জানিতে চাহিলাম। গোসাই বললেন—অয়, উদরী, শোক, নাত, পৈতৃকদিদি এই আসনে বসলে দুর হয়; আরও অনেক উপকার হয়। অভ্যাস করলে ক্রমে জানবে।

গুরুনিঃশিয়া সম্প্রদায়।

এক গুরুনিঃশিয়া সম্প্রদায় বিশেষ ব্যাপ্ত।

বড় দাদার আজ এখানি পত লইয়া গোষ্ঠী মহাশয়ের নিকটে গেলাম। আমরে রবেশমাহে শ্রীধর ও ললাক্ষতি সকলে বলিলেন—'গোসাই খুব অন্যহস্ত। অরে মাথা ধরায় প্রায় বেছেন অবস্থায় শয়াত আছেন। আজ দেখা হইবে না।

ঠা গোষ্ঠী, আমি কীতে না বলিয়া, বাহিরে আমারাছের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। মনে মনে গোসাইকে অরণ করিয়া দর্শনের প্রার্থনা করিয়া পিতাম। গোসাই ভিতর বাড়ীতে কোথায়ও ছিলেন। গৃহের দার নন্দ, মা ঠাকুরানী স্বীয়মান বোগাতে দেবী মনে নিকটে ছিলেন। আমার খবর কেহই গোসাইকে দেন নাই।

ঠা মা ঠাকুরানী অনেক দরজা খুলিয়া শীর্ধরেকে বলিলেন—'শ্রীধর, গোসাই বললেন—
‘কুলা বাহিরে অপেক্ষা করছে; তাকে ভেকে দাও।’ আমি ধরেনট পাইয়াই কোথায় গেলাম; গোসাই বিছানাহইতে উঠিয়া বসিলাম। বাম হতে নিজের ‘কপাটি’ (কপালট টুপিয়া ধরিয়া আমাকে কিঞ্জাসা করিলেন—‘কী জন্ম এসেছে?’

আমি দাদার পত্রখানা পড়িয়া শুনাইলাম। মোট কথা এই লিখিয়াছি—‘মহায়া
ল্যাঞ্জার বাবা আমাকে বড়ই ভাল বাসলেন। এক দিন তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠিলেন। আমি দুরহইতে তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিলাম ‘বাবা, আমার বড় অবিশ্বাস। দরা করিয়া আমাকে বিশ্বাস দিন।’ ল্যাঞ্জার বাবা তার মাথায় উজ্জ্বলি সমুদ্রের দিকে কপালের
উপর দিয়া ফেলিয়া, তার ভিতর দিয়া আঁক্ড়ে আঁক্ড়ে খুব সংহ দৃষ্টি করিয়া, আমাকে
বলিলেন—‘আঁচল, বাঁচা, আবু হো গিয়া। তুমীলা বিশ্বাস বন গিয়া। চলা যাও।’
আমি অমনি বাবাজীকে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম। ঐদিনহইতে ভগবানের নাম
পাওয়ার জন্ম আমার প্রাণ সর্বদা হইতে পড়িলাম। আমি কে কত শ্লোক নামিয়া জানিন;
কিন্তু তাহাতে কিছুই হইবে না, মনে হইল। কেহ আমার যদি আমাকে ‘গাছ গাছ’ বলিয়াও
জগ করিতে বলেন, তাহাই ভগবানের উদেশ্য জগ করিয়া। আমি কুতুর্থ হইব, মনে হইতে
লাগিল। এই সময়ে বিদ্যাধ্যায় মহাশয় আমিই অযাচিতভাবে নাম দিলেন। ভগবানেরই
ইচ্ছা মনে করিয়া, উহা আমি গৃহণ করিলাম। এখন নাম জগ করিতে গিয়া আমি বাড়ী,
ঘর, ব্রী, পুত্র, এমন কি নিজের দেহ পর্যন্ত ভুলিয়া যাই। এ রাজ্য ছাড়িয়া অন্য একটা
রাজ্যে প্রবেশ করি, আর আনন্দ ভুলিয়া অজ্ঞান মত হইয়া পড়ি। ইহা কি নামেরই
শ্লোক, না ল্যাঞ্জার বাবার কপারই ফল, জানি না।” ইত্যাদি। পত্রখানা জনিয়া গোসাই
বলিলেন—সুন্দর অবস্থা! শুনে বড় আনন্দ হলো। গতবারে তুমি তাঁকে বড় ভাল চিত লেখ নাই। এ চিঠি আমি তোমাকে যে ভাবে লিখিতে বলেছিলাম সেরূপ হয় নাই। এই সময়ে তোমার নাম যেরূপ ছিল তাতে ঐরূপ না লিখে পার না, তা ঠিক। যাক, এখন গিয়ে তাঁকে খুব উৎসাহ দিয়ে পত্র লেখ।
তিনি যে সাধন করছেন তাই করুন, তাতেই তাঁর মঙ্গল হবে। ল্যাঞ্জার বাবা
একজন খুব উঁচু দের সিদ্ধপুরুষ; তাঁর দৃষ্টির ফল অবশ্যই পাবেন। বিশ্বাস
লাভ হলেই অনেকটা হ’য়ে গেল। বিশ্বাসে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছান যায়।
শেষ অবস্থায় শক্তির প্রয়োজন হয়। শক্তির আবশ্যকতা বোধ হ’লে তখন
অমনির কাছে যেতেই হবে। কিন্তু সে অবস্থাও তেন সহজ নয়।
গোসাই আবার আগণ কথা শেষ না হইতেই বলিতে লাগিলেন—তুমি ত এখন গভীর সন্তান !
তোমার আর চিন্তার কি আছে ? মা যে মন গভীর সন্তানের অবস্থা টের পান, সন্তান নড়াচড়া করলে আরম্ভ বৃষ্টি পারেন, ওরু সেই নিকট শিশ্রের সমস্ত অবস্থা, সমস্ত চেষ্টা সর্বদা জানতে পারেন। সন্তান যতকাল ভূমিত না হয়, ততকাল তার কোন ক্ষমতাই তাকে না। মা যা কিছু আহার করেন তারই একটু একটু রস নাড়িয়া ভিতর দিয়ে সন্তানের দেহে সংরক্ষিত হয়; শুধু তাতেই গভীর শিশুর পুষ্টি হতে থাকে। সেইরূপ ওরু যা কিছু লাভ করেন, শিশু শুধু তারই অংশ প্রয়োজনমত পেয়ে থাকে। ওরুর উন্মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই শিশুরেরও উন্মুক্তি। তার পর, ছেলে ভূমিত হলেও মা-ই তাকে আহার দেন; প্রয়োজনীয় সমস্ত যোগাড় করে, মা-ই তাকে লালন পালন করেন। যেদিন তার চলাফেরার খাওয়া দাওয়ার তেমন ক্ষমতা না জেনে, ততকাল মা তাকে চোখের আড় করেন না, সর্বদা চোখে চোখে রাখেন। কিছু শিশু সিংহ অবস্থা লাভ করলেও সদাস্মুকুর তাকে চাড়েন না, ওরু তাকে তখনও শিশুর যত কোলে নিয়ে থাকেন, সর্বদা সকলবিষয়ে ওরু শিশুর সুবিধা দেখেন।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন—সংসারে যে সব মেয়ের সন্তান হয় তাদের গভীর্ণ সন্তান আপন আপন মা'র গর্ভে থেকে সকলই প্রয়োজনমত মা'র ভূত্তি বস্তুর অংশ পায়। ছেলে ভূমিত হলেও সকল মা-ই যতের সহিত সন্তানের প্রতিপালন করেন। এখন তোমার মা'র গর্ভে না জামালে কোন ছেলে আর বাচবে না, তার অসুখী হবে, অবলম্বন ধরবে—এসব যদি মনে কর, তা ঠিক হবে না। মা যদি তেমন হন, তোমাদের মা অপেক্ষাও অধিক শ্রেষ্ঠ যত্ন সন্তানকে লালন-পালন করতে পারেন। তা হলে তোমাদের অপেক্ষাও ভালই হওয়ার কথা। মা'র শুধু ধানেই সন্তানের বৃদ্ধি। মা'র গর্ভে জেনে খুর ভাল শুধুয়া পেলে, সন্তান খুর ভাল হবে না কেন ? সকলেরই যে এক মা হবে, এমন কিছু নয়।
ভিন্ন ভিন্ন মা’র গর্দ সন্তান জন্মে স্থায়ত্ব মাদক ধারকুক। ভবানীরও এই ইচ্ছা। 
তুমি ফয়জাবাদে যাও, বেশ উপকার পাবে। মধ্যে মধ্যে খুব ভাল ভাল লোকের 
দর্শনও মিলবে। সকলকেই খুব ভক্তি শ্রদ্ধা ক’রে। সামাজিকভাবে রেখো না।
জিন্দাসা করিলাম—ওরুতে তেমন নিষ্ঠা না জমান পর্যন্ত অস্ন সাহুর সঙ্গ করা ভাল?
গৌরাঙ। অন্য কি? অন্য ভেবে অন্যের সঙ্গ করবে না। এক গুরুশক্তি সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে—এই ভেবে সঙ্গ করলে, সকলের সঙ্গে উপকার 
পাবে। রক্তাধারে রক্ত থাকে; তাই বলে কি শরীরের অন্য স্থানে রক্ত নাই? 
রক্তের আধার—মূল স্থানই—রক্তাধার। সেইস্থানে রক্ত সঞ্চালিত হ'য়ে, 
সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছে। সমস্ত শরীরে যে রক্ত ভাল এ রক্তাধারেরই 
রক্ত। কিন্তু এ ঠিক যে, রক্তাধারে রক্ত না থাকলে শরীরের কোথাও রক্ত থাকতে 
পারে না। সমস্ত বিশ্বব্যাপী এক গুরুশক্তি। সঙ্কীর্ণভাবে কিছু নয়। সঙ্কীর্ণভাবে 
বড় অনিষ্ঠ হয়।
জিন্দাসা করিলাম—ওরুতে একিনিষ্ঠতাতে কি সঙ্কীর্ণ ভাব নয়?
গৌরাঙ। না, তবে সঙ্কীর্ণ ভাব বলে না। যে রক্তাধারটি ভাল ক’রে জানে 
সেইহাও জানে যে, এক রক্তাধারেরই রক্ত নানা পথ দিয়ে সরবরাহের ব্যাপু 
হ'য়ে পড়েছে। সে সরক্ষত একই বস্তু দেখে।
গৌরাঙ একটু থামিয়া আবার বলিলেন—
ওখানে গিয়ে সাধনটি গোপন ক’রে। আর দাদাকে খুব উৎসাহ দিও। 
আপনাদের সাধন ভঙ্গে নির্দোষত্ব কাহাকেও করতে নাই। ওরূপ করা বড় 
দোষ। যিনি যে পথেই চলেন না কেন, উৎসাহই দিতে হয়; কারণ এই সাধন 
গ্রহণ করতে অনুরোধ ক’রে না। তোমার দাদাকেও প্রয়োজনমত ভগবানই এর 
ভিত্তি অর্জনে।
আমি। সমস্ত সাধনই কি গোপনে করতে হবে?
গৌরাঙ। ঘর দূর পারা যায়। এই গোপনেরই জিনিস। খুব সবাধানে 
থেকো।
গৌরাঙ এক হাতে, সাথে টিপিয়া ধরিয়া। অক্ষ থেটায়ও অধিক সময় আমার সঙ্গে কথাবার্তার।
পৌরানিক।]  
শ্রেষ্ঠ কথা।  

কহিলেন। দাকুন জরে, অলস শিরেগোড়ায়, আশ্চর্য স্বরূপ দেখিয়া আমি অবাক হইলাম।  
বাসায় আসিয়া ঠিক করিলাম, অহ্মী বাড়ী যাইব।

শ্রেষ্ঠ।—সাধন পাইতে মেজ দাদার বসতী।

বাড়ীতে আসিয়া তিন দিন থাকিলাম। একটা স্থান দেখিলাম—বেন মেজ দাদার নিকটে  
উপস্থিত হইয়াছি; তাহাকে দেখিয়া মনে হইল তিনি অন্ধের হংসগুচ্ছ কোনও যশ্নায় অহিন্দি  
আলিয়া যাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন—‘শান্তি কিলে হয়,  
স্থান,  
বলুন পারিস্?’ আমি বলিলাম—‘গোসাইরের আশ্রয় নিলে শান্তি  
হয়। তিনি দীক্ষা দিয়া সমস্ত ব্যখ্যার মূল কাটিয়া যায়।’ মেজ দাদা  
গোসাইরের আশ্রয় লইতে বাঝত হইয়া। বলিলেন—‘তিনি কি আমার মত লোককে সাধন  
দিয়েন?’ আমি বলিলাম—‘তিনি বড় দয়াল; এখানে হ'লে নিশ্চয়ই দিয়েন।’ এইটুকু  
বলার পরেই নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

মুগ্নের যাইতে আদেশ।  

আগামী কলা পশ্চিমে যাইব। গোসাইরী মহাশয়ের নিকট হইতে অন্তমতি লইতে  
১২ই পৌষ,  
গৌণারিয়া-আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। গোসাই অনুযায়। শুনিলাম,  
বৃষ্টির।  
তৎকালে কোঠায়ের ধ্যানই আছেন।

আমি গিয়া দরজায় বাহিরে প্রাণম করিলেই, তিনি চোখে মেলিয়া চাহিলেন। নিজ আসনের  
একপাশ দেখিলাম—‘এখানে বসো।’ আমার সকলের বোধ হওয়ায় মেঝেতেই  
বসিলাম কিন্তু তিনি বারংবার জেগ করিয়া লাগিলেন দেখিয়া, আসনের একপাশে আস্ত  
একখানা আসন নিয়া বসিলাম। তিনি আবার ধ্যানই হইয়া পড়িলেন, কথা বলিবারও  
অবশ্যই পাইলেন না। এ সময়ে আর কখারিয়া বলাও ঠিক নয় ভাবিয়া, আমি বাহিরে  
আসিবার উচ্চার করিলাম। প্রাণম করাতে ধ্যানবল হইল। আমাকে বলিলেন—  
কি? করে যাবে স্থির কর্জে।  

আমি। আজ রহে।  

গোসাই। তা হ'লে এখানেই এসে থাক না? দোলাইগঞ্জ স্টেশন খুব নিকট;  
এখান থেকে যাবার সুখিয়া হবে।

আমি। একবারেই ঠিকই করিয়া যাইব। এখানই তে সে সুখিয়া নাই।
গোসাই। এখানেই নারায়ণগঞ্জে গিয়ে না হয় টিকিট করবে, সময় যথেষ্ট পাবে; তাতে আর অসুবিধা কি?

আমি। আর কখনও ওরাকাঁই চলি নাই; তাঁই একবারে সোজা টিকিট করিয়া যাওয়াই হবে না কি?

গোসাই। তোমার আশঙ্কা যখন হ’চ্ছে, তখন তাই কর। একটু ভাড়াতাড়ি ফুলবেড়ে যেতে চেষ্টা করো;—টেন্ডু ‘মিস্’ হ’তে পারে। কলকাতা গিয়ে বেশী দিন থেকে না; একদিন বিশ্রাম করো; না হ’লে রাস্তায় অসুবিধা হ’তে পারে। তোমার সেজ্জা রুখই মুক্তে আছেন? মুক্তের বড় সুন্দর হ’ন।

এখন বিছুকাল গিয়ে তারই কাছে পাক; সেখানেই এখন তোমার থাক।

গোসাই। বেশ পাকবে, উপকার পাবে। পরে ফয়জাবাদ যেও। উৎসাহের সহিত সাধন ভজন করো; তা হ’লে সব ভাল হ’বে পারবে। কোনও চিন্তা করো না।

ভয় কি?

আমি এই সময়ে একশিশি জলে গোসাইয়ের পাদাঙ্গে স্পশ করাইয়া চরণামৃত করিয়া লইলাম। চরণামৃত দিয়ে দিয়েই গোসাই দাহজানশুভ হইলেন। গোসাইয়ের সমাহিত দেখিয়া, আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

আর প্রভুত্ব উঠিয়া ফুলবেড়ে (ঢাকা) দিশেন রওনা হইলাম। নবাবপুরপুণ্ডর পৌছিতে গাড়ী চালিয়া দিল; টেন্ডু ‘মিস’ হইল। গোসাইয়ের কথা মনোনয়ন করিলে আমার এ ঘটনা দৃষ্টি না।

একটি মেমের মহত্ত্ব।

শেষ রাত্রিতে দোলাঙ্গে দিশেন পৌছিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। নারায়ণগঞ্জ দীর্ঘের ১৯ই পৌর, একটি মেমের আশ্চর্য দরা দেখিয়া অবাক হইলাম। তীম সারাদিন গুরুদাই।

প্রায় সন্ধ্যায় উপরের দিয়া চলিয়া, সদায় সময়ে গোসাইলাম। পরীক্ষা পুরোনোতের একটি অসহায় নীচররীতি। অস্ত্র ধরিয়া বহিতার প্রতি বিশ্বাস শুরু। হইল। জাহাজের কর্তারা তাহাকে চড়ার উপরে ফেলিয়া যাইতে পরামর্শ হইয়া করিল।

বাংলায় বাড়ি জাহাজ। আবিষ্কার সংক্রমণ রোগকে সরাইতে উৎসাহ নিয়ে লাগিলেন। একটি মেম তখন কাহাকেও কোনও কথা না বলিয়া, রোগলকে কোনে তুলিয়া লইয়া নীচে চলিয়া।
গেলেন। দাঙ্গাভিত্তিক ময়লা কাপড় চোপড় ফেলিয়া দিয়া, আপন মুলানান বলাবড়ি তাহার বাংবাহরে দিয়া, বহুলেখী সেবা গুরুত্ব করিয়ে লাগিলেন। তাহাকের কর্তৃক তাহার নানা গ্রামের তাহাদের সংসদের বিভাগে বিভাগ করিলেন। মেমের সেখানে শুরু তার ও সাধারণ কংগ্রেস সুপারা বলিয়া কলিকাতার মেমের সেখানে একটি অসাধারণ নদী নামে ডেস্কো আচ্ছাদিত হইল।

মেমের সচিত্র অলাপ করিয়ে বড় ইচ্ছা হইল। আমি উহার কাছে যে গিয়া ধাঁড়াইলাম। বোঝিয়াও সেখায় করিয়ে করিয়ে মেম আমাকে বলিলেন—‘ভাই, তুমি যীশুপ্রেমি মন্তিতাদিতা বলিয়া বিশ্বাস কর?’ আমি বলিলাম—‘হা, তিনি মহাপুরুষ, মুক্তি দিতে পারেন। তাহার উপরে আমার খোবই উচ্চ ভাব আছে।’ মেম বলিলেন—‘তুমি যাহাকে উচ্চভাব বলিতেছে, তাহা অপেক্ষা নীচ ভাব যীশুপ্রেমির উপরে কখনও মাহুষের হওয়া সত্ত্বে কি? তুমি তাকে মহাপুরুষ বল।’ যীশুপ্রেমির প্রতি মেমের এই একটি নিথা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। কিন্তু তবু আমি তাহার নিকট তর্ক কেটিয়া দিলাম।

মেম বিশ্বাস করিয়ে তাহাকে না করিয়ে কছিলেন—‘না, সত্য বলিয়া তাহার বংশ বজ্রকল্ল আমি তর্ক করিয়া অথচ সময় নষ্ট করিয়াছি; কিছুই বরং নাই; শাহীত পাই নাই। সত্যবান কখনও শুধু তর্কের দারা নিষ্ক্রিয়তা হয় না। অস্তাক্ষে তর্কের দারা সত্যের বিশ্বাস দেওয়া হয়। একজন বিশ্বাসের দারা সত্যের আমার কাছে জানা যায়। যীশুকে বিশ্বাস কর। তাহার কৃপায় তাহাকে জানিতে পারিবে।’ মেমের এই কথা কঠিন আমার থেকে বলিল।

সতীশের প্রতি গৌীগাইয়ের রূপ।

প্রতী দিকে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলাম। সতীশ বিশ্বভূখু মহাবিদ্যুত, জানন্দেশ্বরে ১৩৩৪ পৌষ, দিন, এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত সংযোগ হইল। ইহারা সম্বন্ধে মিঠামার সাথে গৌীগাইয়ের কাছে সাধন গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের বিভিন্ন গৌীগাইয়ের উপরে ইহাদের অসাধারণ নিষ্ঠুর ও ভক্তি জয়ীমাত্র, আলাপে জানিলাম। সতীশের ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনা। তাহারই মৃত্যুর আগ্রহ করিয়া আবার হইলাম।}

সতীশ বলিলেন—‘ভাই, যেবানের গ্নানজ্ঞানই মহান উত্তেজনায় পড়িয়া কত কাটা না করিয়াছি। সাধন গ্রহণ করিয়া ভাবিয়া, এবং সেই উপায়সহিতে নিষ্ক্রিয়তা পাইলাম।’ কিন্তু কাছে তাহার কঠিন হইল না, বরং ওবার আরও বহুল কিছুই পাইল। গৌীগাইয়ের
উপরে আমার ভয়ানক অভিষেক আসিতে লাগিল। এই সময়ে একদিন সাধন করিতে বসিয়াছি, অবশ্য আমার উদ্দেশ্য অধীর হইয়া পড়িল। তখন ‘সাধন আর করিব না’, ‘গৌসাইরের কাছেও আর যাইব না’ এই প্রকার ভাবিতেছি, এমন সময়ে অবু ঘরহইতে গৌসাই পুনঃ পুনঃ আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। নিকটে বাইবোস্তর তিনি আমাকে খুব সেহের সহিত বলিলেন—"সতীশ! আমার মাথায় একটি তেল দিয়ে দেও তের। আমি, নিজের হৃদয়ের কথা তাহিয়া, অভিষেকের সহিত একটি তেজ করিয়া বলিলাম—'না, তা আমি পারিতে না।' গৌসাই একটি হস্তাক্ষ আবার বলিলেন—'রাগ করছ কেন? মাথাটি আমার জলে যাছে, একটি তেল দিয়ে দেও না, এসো।' আমি এক গুণ তেল লইয়া গৌসাইরের মাথায় দিতে লাগিলাম। মাথায় তেল দেওয়া গৌসাইরের কোন কালে অভয়াস নাই; অথচ, আমাকে বলিতে লাগিলেন—'দেও, দেও। আমার মাথা ঠাণ্ডা হইয়ে যাচ্ছে। সেই সময়ে আমার যে একটা কি অবস্থা হইল জানি না—শরীর পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, আমি কাপিতে লাগিলাম। সমুদ্রে চাহিয়া দেখি, আজ পাগল মনগুলি স্ত্রীলোকের উপর আমার কুমার হইতে অর্ধেকেঠাব। একটি করিয়া ভাবার কামনা হইয়া। আমার দিকে আসিতেছে এবং পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে। ভয়ে ও লজ্জায় আমি মনের হইতে লাগিলাম। তখন গৌসাই বলিতে লাগিলেন—'দেও, বেশ ক'রে দেও; যতটা তেল আছে সবটাই বেশ ক'রে ধীরে ধীরে ব'সিয়ে দেও।' স্ত্রীলোকগুলি কি ভাবে কোন দিকে দিয়া আসিয়া কোথায় যে গেল তাহা লক্ষ করিবারও অবসর পাইলাম না। একটা কেমন যেন নেহায় আছের ছিলাম। সকলে চাহিয়া গেলে পরে গৌসাই বলিলেন— 'সবটা তেল শুধু গেছে, তা হলে যাও।' আগত অবস্থায় এই প্রকার অস্থূর্ত অনর্থ ব্যাপার দেখিয়া আমি হতর্ক্ষী হইয়া গেলাম। তেলের দিকে যা গৌসাইরের মাথায় দিয়ে মনোযোগ একেবারেই তখন ছিল না। গৌসাইরের কথা শুনিয়া আমার চক্ষু ভঙ্গিল। তখন মাথায় দিয়ে চাহিয়া দেখি—একবিংশ তেল নাই। সেইদিনহইতেই কিন্তু আমার কামভাব একেবারেই নষ্ঠ হইয়া গিয়াছে, কখনও যে ছিল তাহাও এখন করিতে পারি না। এই ঘটনা মনে পড়িলেই আমার কায় পায়। কেবল ইহাই মনে হয়, আমার জন্ম। দেখিয়া দয়া করিয়া গৌসাই আমার সমস্ত কুটাবগুলি নিজেই মাথা পাঠিয়া নিলেন।
অণুস-লাগানে দুর্ভোগ।

ছই দিন কলিকাতায় গাঁথিয়া হাড়া ঠেলেন নিয়া মুঢ়লের টিকটি করিলাম।
অমনই গায়ির গায়ি বাগিল, উদাসসে দৌড়ীয়া গায়ির সম্মতে গেলাম।

১৮ই পোঃ।
গায়ির দরজা পূর্ণই বকা হইয়াছিল। স্তোন ফেলে। হইলাম বুঝিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া ডাকাইয়া রহিলাম। একটি ভদ্রলোক আমার সেই দুঃখে। দেখিয়া, চীৎকার করিয়া বলিলেন—'উদুন, শীঘ্র উঠে পড়োন; দরজা খুলে দিচি।' আমি অমনই চলমান গায়িরের লাফাইয়া উঠিলাম। রাত্রি ১২টার সময়ে মুঢ়লের পৌঁছিলাম।

একথানে একাগায়ি ভাড়া করিয়া মেজ দাদার বাসায় চলিলাম। উপস্থিত হইলা আনিলাম—'মেজ দাদার অভাসায় উঠিয়া গিয়াছেন।' সহরে একটি কাল ঘুরিয়াও মেজ দাদার নুতন বাসার কেনো গেঁজ খবর পাইলাম না। একাওয়ালার বিশ্বং হইল। আমাকে জোর করিয়া পথের মধ্যে একটি স্থানে নামিয়া দিল। তাহাকে আমি একটি পয়সাও দিলাম না। মোট গায়িরী ও বিচারা ইত্যাদি হইয়া সড় রাস্তার উপরে, সেই অন্নকার রাখিতে অর্ধঘণ্টা কাল একটা স্থানে বসিয়া রহিলাম। ওরুদেবের কথাতে একদিন মাত্র কলিকাতায় অপেক্ষা করিয়া অলিলে এই দুর্ভোগ হইত না, মেজ দাদাকে পুরাতন বাসাতেই পাইতাম, পরে বুঝিলাম। যাহা হউক, রাত্রি ২টার সময়ে বিপর হইল। ওরুদেবকে খরান করিয়া লাগিলাম। তাহার অপরীল কুঠার গুণেই হউক, অথবা আকার্থিক ঘটনাশব্দই হউক, এই সময়ে একটি লোক আসিয়া আমাকে বলিল।—'কা বাবু! হংস। কাহে বৈঠা হাত্যা? মন্দ কাপি? আমি মেজ দাদার নাম ও পরিচয় দিয়া।' তাহাকে বলিলাম—'আমাকে তাহার নুতন বাসায় পেঁচাইয়া দিতে পারি।' মুটি বলিল—'বাবু কে হামে পচানুন হাত্যা। চলিয়া।' অতঃপর আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। মুঢ়লের পরম। দেওয়ার সময়ে অহংসান করিয়া দেখি, টাকার খেলায় নাই। রুকের উপর আটা কোটের পকেটে ৮টা টাকা ছিল; তাহার উপরে ছইয়া আমা গায়ে থাক। সরো খেলায় কি করিয়া যে হারাইলা, গেল বুঝিলাম না! মনে হইল, একাওয়ালার উপর অতিরিক্ত অত্যাচার করার ওরুদেবের কুঠার করিয়া আমাকে এই দণ্ড দিলেন। সমস্ত রাস্তায় অন্য একটা শক্তির খেলা হইলা। গেল, দেখিয়া পোঁচাইয়ের উপরে আমার চিত্ত অথিক্ত আকৃষ্ট হইল। পডিল। কুঠার কুঠার ঘটনার ভিতর দিয়া নানা প্রকার অবস্থায় ফেলিয়া যে ভাবে তিনি তাহার চরণে এই চিত্রটিকে তালিয়া লইতেছেন, তা বলা মাত্র হইতেছি।
ম শ্রী—ক৯হারীর িাটের সলট্য শৱ পথের রহস্য।
গত কলা বিকালেলা মেজ দাদা আমাকে ক৯হারীর িাটে লইয়া গিয়াছিলেন।
২০শে পৌষ, গাঢ়ের উপরে এমন শুন্দর স্নান চোখে না দেখিলে আমি কর্নাও শুনতে পারিতাম না। িাটটি যেন গাঢ়ের মধ্যেই রহিয়াছে। িাটের ১২৯৫। দক্ষিণে বামে ও সমুখে কলকাল রবি নির্শিত আলাশির বেগে প্রবাহিত হইতেছে। বিশাল গাঢ়ের অরণ পারে কেবল কাল মেজের মত পাহাড়-শ্রেণী দেখা যায়। িাটে বসিয়া এত ভাল লাগিল যে রাহিত ওখানেই কাটাইতে ইচ্ছা হইল। রেখ-বশতঃ মেজ দাদা আমার সে সঙ্কল্প সম্পর্কে দিলেন না। রাহিত প্রায় কচার সময়ে বাসায় আসিলাম।

শেষরাতে িপ দেখিলাম—‘বেলাবাসনে ক৯হারীর িাটে উপস্থিত হইলাম; িাটের ধারে বেঁধালের একটি পুরান পাক। পথ গাঢ়ের ভিতর দিয়া কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে, উপর হইতে দেখিলাম। নদীর তলা দিয়া রাস্তা; উহার মধ্যে পথেশ করিতে বড়ই কোমুখ জমিল। আমি ধারে ধারে ঐ পথ ধরিয়া চলিলাম। কিছুদৃষ্টি আগসর হইয়া অন্ধকারে কিছুই আর দেখিতে পাইলাম না। চাঁদ সূর্যের আলো ওখানে প্রেরণ করে না। হাতে একটি মশাল লইয়া চলিতে লাগিলাম। রাস্তা ভর্মচন্দ্র দৃশ্য; জল কাদায় আমার উপরপর্যন্ত বসিয়া হাঁটিতে লাগিল। নানা প্রকার ধরিনি ও ভালকার গণেশোল সুনিতে লাগিলাম। সমুদ্রের কি যেন একটা ভ্রান্ত বাগার ঘটিতেছে, মনে হইল। বোধ হইল বিদ্রুপ গাঢ়ের এক-চুর্ম্মাঙ্গ পথ আসিয়াছি। রাস্তার কেশে ও বিভিন্ন কাছে আমার শরীর মন অবসর হইয়া পড়িল; আমি আর আগসর হইতে পারিলাম না। হংসিল মনে ক৯হারীর িাটে আসিয়া বসিলাম। এই সময়ে বাদীর ব্রাহ্মচরী মহাশ্রয়কে দেখিতে পাইলাম। তিনিও ঐ পথে প্রবেশের উচ্চাষ করিতেছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন—“তুই এখানে কেন? ” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“এই রাস্তাটি কোথায় যেন হইয়াছে? আপনার সঙ্গে গিয়া দেখু।” ব্রাহ্মচরী মহাশ্রয় কহিলেন—“তুই তা পার্বী কেন? বেশী দুরে এ পথে দাও। যায় না—বন্ধ; আর ভয়ও আছে।” আমি বলিলাম—“এ পথ বন্ধ হ’ল কেন? কে বন্ধ করেছে?” ব্রাহ্মচরী—“এই পথটি সোজা গাঢ়ের মধ্যপথ। তার পর আর দৃশ্য নিয়েছে।” পথটি কোথায় গিয়েছে সমস্ত জানিবার অন্য ইচ্ছা। প্রাণ করার তিনি ক্রমপূর্বক আমাকে একখানি তীক্ষী নৌকার তুলিয়া নিয়া িাটের সোজা গাঢ়ের মধ্যহ্রেলে গেলেন।
গোহি। ]

প্রথম খণ্ড। ১৩৯

পরে পশ্চিমের কাছে কিছুতর অগাধ হইয়া, নৌকা থামাইয়া বলিলেন—"কয়েকটি মহর্ষি এবং প্রধান প্রধান যোগী পার্শ্বের পাশে গঙ্গার নীচে এইখানে একটি আশ্রম করিয়া রহিয়াছেন। আশ্রমটি খুব নিদ্রিত, বহুস্থান লইয়া বিস্তৃত। মহাপুরুষদের কয়েকজন শিষ্যারা সঙ্গে আছেন। এই আশ্রমটির সহিত ঐ গদারধারের পথটির যোগ আছে। এখানেই উঠে দিতে ভিতরে একটি সুন্দর পথ গড়া ঐ হাজনে ঐ পথে মিশিয়াছে। পাত্রে কেহ সেই সুন্দর পথ দিয়া আশ্রমে আসিয়া প্রবেশ করে, এই আশ্রম কর্তৃক বড় রাস্তার স্থান হাঁসে কাদা জল দিয়া বিষম দর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন; মধ্যে মধ্যে ভাবনাক বিষয়ক সর্পের আবাসও হইযাছে। ঐ বড় রাস্তা ধরিয়া, এই কারণে, কাহারও আর অদিককর অগাধ হওয়ার যে নাই।"

আমি। "আশ্রমে প্রবেশকে কি অস্থ পথ নাই?"

ব্রহ্মচারী। আরও হুটি পথ আছে, তা জেনে তোর লাভ কি? ওপরে প্রবেশ করিতে তোর এখনও টের দেরী।"

আমি। আপনি দেয়া করে একটি পথ আমাকে দেখায় দিন। আমি এখন প্রবেশের চেষ্টা করব না; পথটা ছুরু জানা গাঢ়কুট।

আমার কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী, নৌকাহইতে নামিয়া, গঙ্গার উত্তর পারে ঘাটের বিপরীত দিকে পার্শ্বে লইয়া চলিলেন; বলিলেন—"এই যে সুন্দর পাঠাগুলি দেখিয়াছিলেন, ঐখানে নীচে দিয়া উল্লাসের আশ্রমের দিকে একটি রাস্তা আছে। চলুন, সেই পথে প্রবেশের দ্বার তোমাকে দেখাইয়া দিব।" এই বলিয়া, কতকদূর অগাধ হইয়া, চার ফুট লম্বা, অর্ধ হেডের কথা প্রশস্ত, একটি ফাটি হাস্য দেখাইয়া বলিলেন—"এই যে পাথরের চঞ্চল ভিতর দিয়া ফাঁক দেখি দিস, এই একটি পথ।" আমি উহার ভিতরে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, কোনও হাস্য অতান্ত গভীর অক্ষারসময়, কোনো কোনো হাস্য অল্প কলার মত অর্থ অল্পতেছে; আমার কোনো কোনো হাস্য অনবরত ধূম নির্গত হইতেছে। ব্রহ্মচারী বলিলেন—"এই পথটি সহজে কাহারও নজরে পড়ে না। দিনের বেলার সামান্য সামান্য ধোঁয়া উঠিয়াই মাঝে দেখা যায়। যতই রাত্রি অধিক হয়, এই সমস্তা চঞ্চলের ফাঁকু অমিয় হইয়া যায়। বহুদূরবহিতো এই অগ্নি লোকের চঞ্চল পড়ে তোর যদি ইচ্ছা হয়, এই আলোনের ভিতর দিয়া আশ্রমে নিয়া প্রবেশ কর।"

আমি দেই অগ্নি দেখিয়া ভয় পাইয়া বলিলাম—'এর ভিতরে আমি যাইতে পারিব না। আজ পথ বলিয়া দিন।' ব্রহ্মচারী আমার এ কথায় অতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"বেটে? পথের না বড় বোঝি নিজিন্তি, যা এখান হ'তে চলে যায়।" এই বলিয়া তিনি আর
ভিলান্ধ বিলঙ্ঘ না করিয়া গঙ্গার পারে ঘাটসী। নোকায় চড়িলেন এবং নোক ছাড়িয়া দিলেন। নোক দেখিয়া ঘাটতে লাগিল, তীরে তীরে, আমিও সেইদিকে চুটিলাম। তাঙ্গারকে চোখার করিয়া বলিলেন, “এখন চলে যা, চলে যা।”

এই শঙ্ক তোলায় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পশ্চাদলী বিষয়গুলি পরিচারে যেন চক্ষে অভিষিক্ত লাগিল। সকাল বেলায় উঠিয়া মেজ দাদাকে বিঘ্নসা করিলাম—‘কষ্ঠারিণীর ঘাটের নিকটে কি কোন পুরুষ ওঝ রাজা আছে?’ মেজ দাদা। বলিলেন—‘হা, নবাবী আমলের একটি পথ আছে। তা বহুকাল একবারে বন্ধ।’ আমার বড়ই কৌতুক্ল জমিয়া। পথটি দেখিয়া নির্দেশ নেয়া মেজ দাদার সঙ্গে কষ্ঠারিণীর ঘাটে গেলাম। দেখিলাম কষ্ঠক্ষণ একবারে অবাক হইয়া বসিয়া রহিলাম। কষ্ঠারিণীর ঘাটের প্রায় ৫০৬০ হাত দক্ষিণে এই পথটি রহিয়াছে। ক্রমশঃ নীচে হইয়া রাস্তাটি একবারে গঙ্গার ভিতরে গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। জল এ সময়ে কম বিলিয়া, রাস্তাটির উপরকার একাং বিলম্ব ক্রমশঃ যে লন্ধা ভাবে গঙ্গার গঙ্গে গিয়া একবারে করিয়াছে, ঘাটহইতে বেশ পর্যন্ত দেখে যায়; কিন্তু এই বিলম্ব রাস্তা কোথায় গিয়া যে শেষ হইয়াছে, কেহ বিলিতে পারিল না। শুনিলাম, কিছুকাল পূর্বে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ‘ডিপার’ সাহেব বহ অর্থাৎ এই পথটি যখন চেষ্টা করিয়া নিষ্ঠল হন। নানা প্রকার ভয় ও বিতর্কিক দর্শন করিয়া এবং বহুবিধ বাণিজ্য আওয়াজ শুনিয়া, মুজুরেরা নাকি কাজ ছাড়িয়া পলায়ন করে। বড় বড় বিষ্ণুর সুর উচ্চ ভিতরে আছে, মনে করিয়া সাহেবচ্ছ অস্তায় সঙ্গলে কাজ হন। অনেকেই বলিলেন যে, নবাবদের হৃদয়ে পলাইবার জন্য ইহা ওঝ পথ ছিল; আবার কেহ কেহ একাং অন্যতম করেন যে বিলম্বের অন্দরে আবরণের ভিতরে থাকিয়া নিরাপদ ও বৃহ্ম্য বেগমদের ঘানের অংশ কোথাও নবাব একটি নিত্য ও ওঝ ঘাট করাইয়াছিলেন। যাই হউক, এ সম্পর্কে নিষ্ঠিত কোনও সংঘাত কেহই বিলিতে পারিল না।

পীরপাহাড় ও সাতাকুড়ো

এই বগদশনের পরহ্তে মেজ দাদার সঙ্গে প্রায়ই কষ্ঠারিণীর ঘাটে ঘাটিরেছিল। ১৩শে পৌষ, সন্ধায়র পরে ঘাটের বিপরীত দিকে, গঙ্গায় অপর পারে, পাহাড়ের উপরে, রবিবার। একটা চঞ্চল অর্থ নিত্যই দেখিতেছিল। অগতির স্তর নয়; মনে হয় যেন ৮০১০ হাত হাঁস ব্যাপিয়া ছুটছুটি করিতেছে। সহরের বাবুগঞ্জে এ বিষয়ে বিঘ্নসা করায় তৃষ্ণার বলিলেন—‘এ অর্থ অথবা রাজ্যে, অস্তকাকার পকে বেশ পরিকাঠা দেখা যায়। আমরা বহুকালযাত্র এই অর্থ দেখিয়া আসিতেছি। কিসের অর্থ, কোথায় অর্থ, তাহাতে বিলিতে পারিল না।
পৌষ।]  

আমরা জানি না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে মনে ব্রহ্মচারী মহাশয় ঠিক ঐ পাহাড়ের নিকটে ফুটি চটাল দেখায়িয়াছিলেন, এই অমীত সেই স্থানেই দেখিতেছি।

মেঘ দাদার সঙ্গে এক দিন পীরপাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম। মুসল্লিনের ঠিক পীর-পাহাড় বেশী দুরে নয়। পীরপাহাড়ে উঠিয়া একটি কবর দেখিলাম। একটি মুসলমান হইলেন অভিজ্ঞ এবং এখানে কেনও একটি কবর দেখিলাম। কথ্যের কথ্য বাকুল হইলেন তিনি গুহ পরিবার ও বিপুল সম্পত্তি পরিব্যাপ্ত এখানে আসেন। এখানে দীর্ঘকাল থাকিয়া, তিনি কাঠের সাহের ভজন করিয়া পীর হন। দেহায়ক করিয়া এখানেই তাহাকে কবর দেওয়া হয়। সেই অনিঃসার তাহারই নামে এই পাহাড়কে পীরপাহাড় বলে। পীর সাহেবের আত্মশক্তিশালী সিদ্ধপুর্ণ ছিলেন।' হানিকটা দেখিয়া বেশ আরাম ভোগ হইল। পায় এক ঘণ্টা কাল পীর সাহেবের কবরের পার্শ্বে বসিয়া নাম করিলাম। গৃহের একাংশ সন্ধ্যায় এই পীর সাহেবের একাংশ সঙ্গে বসিয়াছিলেন—'একটি পীরপাহাড়ে বেড়াইতে গিয়েছিলাম। অক্সামত চারিদিকে অদ্ভুত দৃষ্টিকেন্দ্র ভরকে ভরকে বড়ুটি এল। বিষম বিপদ! থেকে দেখে কোথায় মাঝা রাখানর একটি হাত নাই। কি তার করবে? পীর সাহেবের কবরের পার্শ্বে দিয়ে রোল রইলাম। ফকিরের সাহেবের অতুল পোহার! রুপারণে আমার চারদিকে ভেসে গেল, কিশু আমার শরীরে এক ফুটা জলও পড়লো না।' পীরপাহাড়ের কথা গৃহের মধ্যে পুর্বেই জুলিয়াছিলাম, এখন প্রথম করিয়া কৃত্তর হইলাম। ফকিরের সাহেবের কবর প্রদর্শন ও নমস্কার করিলাম। বড়ুটি ভাল করিল। এখানে ভগবানের নাম করিয়া একটি বিশেষ অভ্যন্তরীণ হইল। গৃহের একাংশ দেখিয়া অরণ করিয়া প্রার্থনা করিলাম—যেন এইরূপ নির্জন পাহাড় পরিবে থাকিয়া। সাধন ভজন করিয়া কৃত্তরদিতি তিনি ঘটাইয়া দেন।

পীরপাহাড়হইতে সীতাকুণ্ড অধিক দূর নয়। আমরা সীতাকুণ্ডে গেলাম। জুলিয়াম সীতাকুণ্ড এই কুণ্ড প্রাক্তনবাদিক করিয়াছিলেন বলিয়া কুণ্ডটির নাম সীতাকুণ্ড হইলাম। কুণ্ডটি দৈর্ঘ্যে প্রায় আশ্চর্য ১০১২ ফুট হইল। কত গভীর বুঝিলাম না। স্থানে স্থানে জলের নীচে অন্ধকার দেখা যায়। অধিকাংশ অতুল ফুটিয়া জল টপ্পুরটি করিয়া উঠিতেছে, হাতে স্পর্শ করিয়া যে নাই। কুণ্ডহইতে অতিক্রিয় জল নামকারের জন্য একটি বাড়ী না থাকে উদয় হইল। ফেরে কুণ্ডে হঠাই পাড়ি গেলে তৎক্ষণাং তাহার মৃত্তিকার অবধারিত।
এইজন্য সেই চতুষ্কোণ কুণ্ডের চারি ধারে লোহার ‘রেলিং’ (বেড়া) রহিয়াছে। রামকুণ্ড ও ভরতকুণ্ড সীতাকুণ্ড ও কয়েক হাত তফাত। এসব কুণ্ডের জল ঠাণ্ডা। সীতাকুণ্ডে উপনিঃস্থ হওয়ার পরই আমার পিতৃপুরুষদিগকে অক্ষরাং মনে পড়িল। কাহারো যেন আমার হাত হইতে এই কুণ্ডের জল পাইবার প্রত্যাশায় এখানে আসিয়া উপনিঃস্থ হইয়াছেন, এই রকম একটা ভাবে আমাকে অস্ফুর করিয়া তুলিল। ইহা কি হার প্রভাব না অস্ফুর কিছু হানি না। আজ তর্কসিদ্ধি আমি চিনিনই কুসংঝার বলিয়া মনে করি; কিন্তু আমি হস্তির ধ্বংস করিতে পারিলাম না। রামকুণ্ড ও ভরতকুণ্ডে অবগাহনপূর্বক, কিয়া মূলে সীতাকুণ্ডের নালায় গিয়া হার করিলাম। হারে বড় আঘাত বোধ হইল। পিতৃ-পুরুষদের শ্রম করিয়া। ২৪ গুণে জল দিয়াই হই করিয়া আমার করা। অস্ফুর পড়িল। তিনি একটা অপূর্ব শক্তি অন্তর্ভুক্ত করিয়া লাগিলাম। মূল-মূল হইতে সরলবিন্দু নিষ্ঠাবানু অসংখ্য লোকের যে ভাবপ্রভাবে এ হারের অধঃ উদ্দো ও চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত, আজ বোধ হয় তাহাতেই আমার চিহ্নে এমন অভিভূত ও মৃত করিয়া ফেলিল। এই হারে গুরুদেবের কুপার বিশেষ নিদর্শনও পাইলাম।

আপনের সাফল্য। মুক্তের আগমনের সার্থকতা। মেজ দাদার
সাধনপ্রার্থনা ও গৌসাইয়ের সম্মতি।

মুক্তের অস্ফুর বড়ই আর আমে দিন যাইতেছে। আজ মেজ দাদার আমাকে কথায় কথায় কহিলেন—‘গ্রাণে একটা শাতি বিচ্ছিন্নেই আসিতেছে না। কি করিলে গ্রাণে শান্তি গ্রহণ করিব ?’ আমি অস্ফুর বলিলাম—‘গৌসাইয়ের অস্ফুর নিলে। শান্তি হয়। তিনি যে সাধন দেন তাহাতেও দৃষ্টি করিতে পারিলে, অন্যতে কখনও অশান্তি আসে না।’ মেজ দাদার বলিলেন—‘তিনি কি আমার মত লোককে দৃষ্টি দিয়া দেবেন ?’ আমি বলিলাম—‘আপনি অবাল করিয়া একখানি পত্র তাহাকে লিখিয়া দিন। নিঃশব্দেই তিনি সাধন দিয়েছেন।’

আমার কথায় মেজ দাদার গৌসাইকে পত্র লিখিলেন। অবিলম্বে উত্তর আসিল।
গৌসাই লিখিয়াছেন—
শ্রদ্ধাস্পদেয়!

আপনার পত্র পাইলাম। আপনাদের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। যে পরিস্থিতে দেখা না হয়, মাঝে মাঝে কুমিল্লার সংবাদ জানাইবেন।
কুলদাদাকে আমার আশীর্বাদ জানাইবেন।

শুভকাজ্জলি

শ্রীরমকৃষ্ণ গৌসাই।
গৌদাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই মেজ দাদার আশা পূর্ণ হইবে, গৌদাইয়ের এইপ্রকার-আকৃষ্টাব্দী পাইয়া আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না। পূর্বদিকে বলত আমার এইভাবে অক্ষর অক্ষরে সত্যে পরিণত হইল দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। ফয়জাবাদে যাওয়ার ছোট হইতে বিরত করিয়া গৌরাই আমাকে তখন মুল্লের পাঠাইলেন কেন, তাহারও তাৎপর্য এতদিনে বুঝিলাম। এখন তো দেখিয়েছি দীর্ঘকালের পরহইতেই জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার অন্তরালে থাকিয়া গুরুদেব যেন ইচ্ছাশক্তির দার। আমার সকল বিষয়েই অবস্থা করিতেছেন। ঘটনাবলীর প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে অক্ষর নিবন্ধন বিশ্বেষপ্তই আমার এক সংস্কার জর্জিতচে—না, যথার্থই এসব ব্যাপারে গুরুদেবের কোনও হাত আছে, পরিস্ফোরণে বৃত্তি পারিতেছি না। চিন্তা কিরূপ গুরুদেবের দিকে আপনি আপনিই টানে।

মুল্লের আসিয়া জল-বায়ুর গুণে শরীর একটি স্বৰ্গ আছে। প্রত্যেক গঙ্গামান করিতেছি; সাধন ভজনও উৎসাহ যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। শেষরাত্রে উঠিয়া প্রাণায়ম কৃতকরণ করি। অতি প্রাতঃ হইত মূখ ধূমিয়া আসনে বসি; এলা ৭॥ টা পর্যন্ত তাটক সাধন করিয়া, মেজ দাদার সঙ্গে চা পান করি। পরে ৯॥ টা পর্যন্ত আমার নাম সাধন করিয়া কাঠাই। ১০॥ টার মধ্যে আমাদের হাতাহাতির সব শেষ হইয়া যায়। তৎপরে পিতাভাবে আসনে অপরাধ ওটা পর্যন্ত বসিয়া থাকি। মন্ত্রের কাজ সারিয়া মেজ দাদা বাসায় ফিরিয়া আসিলে, তাহার সঙ্গে কথাবার্তায় দিন শেষ হইয়া যায়। সখ্যার পর রাত ৯॥ টা পর্যন্ত বিশেষ আর কোনও কাজ হয় না। আহারাতে নিতান্তে না হওয়া পর্যন্ত সাধন করি। এইভাবে আমার সময় কাটিতেছে।

২য় স্থগ। ফুলগাছের অমৃতাভাবিক মুখ্য।

এই সহস্রের মধ্যে আমি কোনও রুক্ষের ডালা, পাতা, ফুল বা ফল ছিৃতত্ত্বি বলিয়া পৌষসভ্যঃ, মনে পড়ে না। জীবন্ত রুক্ষের আনাদেরই মত অর্থভব-শক্তি আঁচচ—১২৯৩। গৌরাই মহাশয়ের মুখে ইহ শুনিয়া আমারও তদবধি এইসহে একটি দৃষ্ট সংস্কার জঙ্গিয়া গিয়াছে। গাছের ডালা পাতা কাহারকেও ছিড়িতে দেখিলে তাল লাগে না; বড়ই কষ্ট হয়। এমন কি, মেজভাবে রাগার অভি তরকারী কুটেন সে স্থানেও থাকিতে পারি না; দেখিলে প্রাণ লাগে। মেজ দাদা কতকগুলি ফুলগাছ বারেন্দার ছাদে আমার কোথার সমুদ্র সাঙ্গাইয়া রাখিয়াছেন। প্রতিদিন সকালে বিকালে এই গাছগুলিকে
আমি নিঃস্ব হাতে জল দেই। চাকরালী জল দিতে চায়; কিন্তু তাহাতে আমার তৃষ্ণা হয় না।
আমাদের পার্শ্ববর্তী বাড়ীর বারেন্দ্রের ছাদ আমাদেরই ছাদের এককালে সংলগ্ন; উল্লভ বাড়ীর
এক ছাদ বলিতেই হয়; মধ্যে সামান্ত ২। হাত উচ্চ একটি প্লাট্ট দ্বারা পৃথকু করা আছে।
পুরুষ ইন্দুপেক্ষার শ্রীযুক্ত অধ্যাপক বাহু পাশের বাড়ীতে থাকেন। তিনিও কতকগুলি দ্বার
ত্রুটি স্নান ফুলগাছ আমিরা আমাদের ছাদের লাইন ধরিয়া সাধারণ রাখিয়াছেন। হুই ছাদের
ফুলগাছের শোভা দেখিয়া বড়ই অসাধ্য হয়। রাত্রি ৩টার সময়ে নাম করিতে করিতে
এক দিন নিঃস্বাশে হইল। খুঁড়ে দেখিলাম—আমাদের ফুলগাছে আমি জল দিতেছি;
অধ্যাপক বাহুর ৩টি ফুলগাছ অফাঁচ নড়িয়া উঠিল এবং আমাকে ধরিয়া খুব
কাতরভাবে বলিল—'ওহে! আমাদের দিকেও একবার তাকাও। আমাদের অবস্থা দেখিয়া
তোমার কষ্ট হয় না? অলিপিপায় আমাদের যে প্রাণ যায়। তোমার হাতে একটি
জল চাই। না হলে আমরা আর বাঁচিব না।' খুঁড়ে দেখিলাম বাগিলাম। মনটি বড়ই
অস্থির হইয়া পড়িল। নাম করিয়া কোন মতে তোমার পরিণাম কোটাইলাম। সকাল বেলা
দেখিয়া, সেই গাছ কয়টি বেশ পতিত। তাবিলাম। 'এলোমেলো রুপ অনেক সময়েই তা
দেখা যায়, ইহাও বোধ হয় তাহাই।' যাহাই হউক মনের ভিতরে একটি কটুক লাগায় অধ
বাহুর চাকরালীর সকলগুলি গাছেই খুব অতুল পরিমণে জল দিতে বলিলাম।
চাকরালী তাহাই করিতে লাগিল। অপর বাড়ীর ছাদ যাইতে নিঃস্ব হাতে অন্য রুপ পরিয়া জল দিতে
আমার কেমন একটি সেকালে বোধ হইল। খুঁড়ে দেখাই পরহইতে গ্রাহ্য সকালে উঠিয়া আমি
এই গাছ কয়টি দেখিয়া আসিতেছি। আজ চতুর্থ দিন, সকালে উঠিয়া দেখিলাম, অন্ধর
ব্যাপার—এক রাত্রিতে সেই ৩টি তানা গাছই এককালে শুকাইয়া গিয়াছে। এ কি অস্বভাবত
ঘটনা, বুঝিতেছি না। কোন পারলোকিক আমার আমার হাতে জলপ্রতাশায় এই ফুলগাছ
কয়টি আশ্চর্য করিয়া ছিলেন কি না আমি না। গাছ কয়টির অবস্থা দেখিয়া অনুভবে আমার
অত্যন্ত যেন দশ হইতে যাইতেছে। আমি গাছ ৩টির জীবনী-শক্তিকে উদ্ধরণ করিয়া ৩ গজ
জল উৎকর কিছুটা দিলাম ইহাতে আমার প্রাণের অলার কতক উপশম হইল।

৩য় খণ্ড। ফল্লসাগরসঙ্গমে যাত্রা। গুরুনিষ্ঠার উপদেশ।

আজ অধিকাংশ খণ্ড দেখিলাম—ক্রমপূর্বে নদীর তীরে বহনসমাকীর্ণ এককাল বাগারে
৮ই মায়, ১২৯৫; উপস্থিত হইয়াছি। নবির পারে, বাগারের ধারে, অসংখ্য নানা রঙ্গের
রবিবার। ছোট বড় নৌকা দেখিয়ে পাইলাম। গোন্ধী মহাশয় একখানা একাংশ
বজ্রায় উঠিয়া সমস্ত শিষ্যবর্গকে তাহাতে তুলিয়া লইলেন। ফল্লসাগরে যাওয়াই আমাদের
উদ্ধৃতি; গোসাইমরা মহাশয়ের পূর্বকার বিষয়ে বন্ধ কোনও একজন মহাশয়া আমাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—‘তুমি আমার নৌকায় এস না? খুব আরামে যানে। আমি তো গঙ্গাসাগরেই থাকিতেছি।’ আমি উঠার কথা গ্রহণ করিলাম না। তিনি শীঘ্র গৈরনে বলিয়া ছোট নদীর সরল পথে নৌকা বাহিয়া চলিলেন। গোসাইমরা মহাশয় হুমকিত ব্রাহ্মণের অংশুক স্রোতে বজারাখানা ছাড়িয়া দিলেন। দেখিয়া দেখিয়া বাতাসের আমাদের সহায় হইল। গোসাই, ‘পাল’নি তুলিয়া দিয়া, নিঃসন্দেহে বসিয়া বাইলেন। প্রাকূর্ব বজসাখানা চোরের করিয়া চলিল। গোসাইমরা কথমত আমরা সকলেই এক একপ্রায় বৈঠ হাতে আইয়া, নৌকা বাহিয়া লাগিলাম। কিন্তু অতি ক্রুদ্ধাকার নৌকায় বৈঠা ফেলিয়া। চাপ দিবার আর অবসর ঘটিল না—বৈঠা জল স্পর্শ করিতে না করিতে নৌকা কোথায় ছুটিয়া বাইলে লাগিল। গোসাইমরা মহাশয় তখন খুব উৎসাহ দিয়া কৌতুক দেখিয়া লাগিলেন। বৈঠা তোলা ফেলা মাত্রই সার, ইহা বুঝিয়া আমরাও অবশেষে হাত উঠিলাম। নিদর্শন তীরের নৌকা দেখিয়া দেখিয়া অল্পকাল মধ্যে গঙ্গাসাগরের নিকটবর্তী একটি চড়ায় পৌছিলাম। নৌকা সেখানে লাগান হইল। চড়ায় নাইরা সকল আমাদের সহিত সানাহার করিলাম।

এই সময়ে দেখি সেই মহাশয়া আমিই উপহার হইলেন। সোজাটুটি শীত আসিবেন ভাবিয়া যে নদীপথ ধরিয়া আসিলেন, হররূপক্ত ভাবাতে বিস্মাদিত হইলেন। প্রত্যক্ষ রতি ও উত্তন করিয়া বাহাস তাহার নৌকায়। দিয়া বিলাস হইল। গত্যন্তর না দেখিয়া, আরণ্যের গ্ৰাম হইয়া একা বাহিয়া তাহার নৌকায় এক বাহিয়া তাহার নৌকায়। এক দিন নিঃশেষ হইল। বিলাস পরে তিনি আমার সঙ্গে ধ্বন্দ্রালোচনা আরম্ভ করিলেন। এতদিনের মধ্যে আমার বিষয়ে তাহার চাড়া দেওয়া হইল।

আমি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম,—‘ভগবানকে লাভ করার সহজ উপায় কি?’

সাধু বলিলেন—‘ভগবানের যথ্য নাম নিয়ে তাহাকে ডাকিয়ে সত্যে তাকে লাভ করা যায়।’

আমি। ভগবানের আবার যথ্য নাম নিয়ে তাকে লাভ করা যায়?

সাধু। তার নামে ডাকিয়ে তাকে দর্শন করে তার মুখে তার নামে ভগবানের যথ্য নাম।

আমি। ওকে নাম হইবে কি একরে? আগে বন্ধ, পরে তো নাম?

১৯
সাধু। কোন এক সময় ভগধানেরই বিশেষ কৃপায় এক শ্রীমতীর লোক জন্মিয়েছিলেন, বার। তারই কৃপায় তাকে লাভ করেছিলেন। তারা, সাধারণের জন্য, ভগবানকে লাভ করার দে সকল উপায় নির্দেশ করে গেছেন, আমাদের মাত্র তাই অবলম্বন। সহজে ভগবানকে লাভ করতে হ'লে সে সকল প্রাণী অনুপস্রষ্ট আর উপায় নাই।

আমি। আমার এখন কি করবা, ব'লে দিন। গুরুকরণ তে আমার হ'য়েছে; প্রাণাদিও গেছে।

সাধু। "তোমার আর চিন্তা কি? সদ্ভূত অশ্রু গেছে। তোমার উপদেশ মত চলেই সহজে ভগবানকে লাভ করবে। তোমার গুরুদেবের কিছুই অন্যতম নাই।"

বল দেখিয়া জানিয়া উত্তরিলাম। কি অশুভ বল। মহাশয়েরও এই তাবে অর্থহোগে দয়া করিয়া গুরুনিষ্ঠার উপদেশ দেন। জানি না। কেবল অবিচারে গুরুর আদেশ-পালনে আমার মতি হইবে।

কষ্টহরিণী ও মুক্তের নামের সার্থকতা।

প্রায় প্রতাপই মধ্যাহ্নে আহারান্তে কষ্টহরিণীর ঘাটে যাই। সকলাবধি সেখানে ১১ই মাস, থাকিয়া নাম করি। ঘাটটি বড়ই মনোরম। একটু সময় বসিলেই বুঝি। গঙ্গার হাওয়ার ও স্থানের প্রভাবে দেহমনের সমস্ত আলাই যেন একেবারে নির্ভর যায়, চিন্তা বিনা চেষ্টায় আপনি আপনিই হির জমাট হইয়া পড়ে। গঙ্গার উপরে এমন হনর ভঙ্গন্ত্রিত আর কোথাও আছে কিনা জানি না। ঘাটটি ঠিক যেন গঙ্গার মধ্যে রহিয়াছে। দক্ষিণে বামে ও সমুদ্রে গঙ্গার দৃশ্য অতি চমৎকার। সাধু-সর্গালীদের থাকিবার অন্য ছোট ছোট ভঙ্গনালয় ঘাটের উপরই রহিয়াছে। এ সব কুটারে সর্বদাই সাধু-সর্গালীর ধানমন্ত্র অবহার বসিয়া আছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। ঘাটের উপরে কষ্টহরিণী প্রতিষ্ঠিত। ইহারই নাম এই ঘাটের নাম কষ্টহরিণী হইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু ও উদাসীনের। এই স্থানে নির্ভরিত আপন আপন অন্যে ভজন নিবিদ্ব হইয়া আছেন। এই স্থানে আসিলে আর বাসায় ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। এত্রাহুতি যে সব স্থান দেখিয়াগে তথ্যে এই স্থানটি সাধন ভজনের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট মনে হয়। সাধু-সজ্জনদের ভজনমণ্ডার এই স্থানে ভগদ্ধাত্মক এমনই একটি আশ্চর্য প্রত্যাহার রহিয়াছে যে ঘাটে উপস্থিত হইলে যথার্থই অন্তরের সমস্ত সত্তা বিদৃষ্ট হইয়া যায়। 'কষ্টহরিণী ঘাট' এই নামটি সার্থক বলিয়া অনুভূত হয়।
মন্তব্য।

গুলিতে পাইলাম প্রাচীনকালে এখানে 'মঙ্গ' ঋষির আশ্রম ছিল বলিয়া সহরের নামও মৃদ্রের হইয়াছে।

4শ সর।—সুরবর আদেশ পালনে সফল চ।

আজ্জ ভোর রাত্রিতে আবার একটি সুদৃষ্ট সর দেখিলাম। সমুদ্র সূরালোকের সর্নে গনানান করিয়৷ একটি বাণান ঘাটে সম্বুত হইয়াছি। সকলেই আপনার ১৭ই মাঘ, ১২৩৫। মনে নান করিতেন। আমি ঘাটের সিঁড়ির উপরে দাড়াইয়া রহিলাম। এ সময়ে দেখি, গুরুদেব একদিকহইতে জলপাতকে শন্দ শন্দ করিয়া আসিতেন। উভয় পাঁচ সমুদ্রে চক্রে দুটি নিক্ষেপ করিয়া আমাদেরই মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্যীনানুসারে ধরিতেছে; তাহাদিগকে ধরিয়া কি বলিতেছেন বা কি করিতেছেন, কিছুই বুঝিলাম না। গুরুদেব কথা দেখিয়া আমার নিকটভূর্ত হইতে লাগিলেন, আমার ততই ভয় হইতে লাগিল, পাছে আমাকেও ধরেন। অক্ষুণ্ণ দক্ষিণে রাখে ও সমুদ্রে সকলকে অতিক্রম করিয়া আদীয়া আমাকেই ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—'পীঠা ছাটা হও, তোমার সর্বনাশে আমি একবার হত দুলায়সে দি। একটা দুর্ভীত অবস্থা লাভ করো বল।' গুরুদেব এই কথা বলমাত্র আমার সর্বনাশ শিহরিয়া উঠিল, উপসু চক্র হইল। 

ঠাঁচুড়ান কারের উত্তরেনায় আমি অহির হইয়া, পড়িলাম। তখন গুরুদেবের চরণে প্রণাম হইয়া বলিলাম—'আমাকে হামিনি কাল একটু অবসর দিন, আমি স্তুতি হচ্ছে নি।' গোসাই পুনঃ পুনঃ ছাটা। হইতে বলিয়াও যখন দেখিলেন কথামত কাজ করিয়ে পারিলাম না, সফল করিতেছি, তখন বলিলেন—'এবার আর হীলা না। তিনি দিন পরে আমি আবার আসব।' এই বলিয়াই অমনি অদুল্য হইলেন।

আমিও জাগিয়া পড়িলাম। সরটি দেখিয়া মন অত্যন্ত অহির হইল।

মৃদুরের বিশুদ্ধত।

প্রায় হুইমাদ কাল মৃদুরে বাস করিলাম, অনেক দিন হইয়া প্রচারক অবস্থায় গোসাই মহাশ্রম কিছুকাল এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার সেহের কথা সত্যিকারের মূল্য এই মৃদুরে হই। শুনিয়া ছিলাম তখন তিনি শোকে উম্মেত্ব হইয়াছিলেন। 'শোকে পহার' নামক একখানি পুস্তক তিনি সেই সময়ের সমস্ত মানসিক অবস্থা বিশুদ্ধরূপে লিখিয়াছিলেন।
১৪৮

শ্রীদ্বয়ের অর্থ বৃত্তি।

এই রুপকথার একজন মহারাজের নামকরণ গোষ্ঠী মহাশয়ের ধর্মীয় এবং আরো পরিবর্তন আছে হয়। ‘আশ্বাসাতীর উপাধিক।-এ গোষ্ঠী মহাশয় তাহার কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছে। এই গ্রামের মহাত্মা কষ্টাহলী বলে সেন মানসিক সকল কথা গলায় নিয়মিত করিয়া শাস্ত্র প্রাদেশ করেন। ঘাটের সৌনাধরের তুলনা নহয়।

বলিহারে আকাশে থাকিয়া সাধন ভঙ্গে বিশেষ উপকার শ্রুতভক্তি করিলাম।

ভাগলপুরের অবস্থান।

বি, এল পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যে মেজ দাদী মুঘলের হইতে কলিকাতা হয়ের সেলে বলার হইলেন। আমি ভাগলপুরে আসিলাম, ভাগলপুরে এ অঞ্চলের কাঝর ও ওয়াগুড়, ১২১১। সকল ইন্সেন্টার মহারাজের ভূগোলপতি শ্রীমক্ক মহরাজাদিউচ্ছ চতুর্দশাখায় মহাশয়ের বাসায় বহিলাম। ভাগলপুরের বড় ভাল লাগিল। মধুর বাবুর থাকিবার বাহীর আরও মনের। এই বাড়ি বহিমার মহারাজের, হিন্দুশাখাটি থাকিবার। অক্ষপত্রের ঠিক গ্রামের উপরে অবস্থিত। এইজন্য বাড়িটির নাম ‘পলিনপুরী’ হইলেন। ‘পলিন-পুরীর’ স্যারস্কে রোয়েক্স প্রাপ্ত করিয়া গণ্ডে প্রাপ্ত হইলেন।

স্থানটি স্থানির নির্মতি, তেমনই আনন্দপঞ্জ। গ্রামের উপরই আমাদের থাকিবার স্থান হইল। কিছু দিন এখানে থাকিয়া খুব সাধন ভঙ্গের এবং সময়ের সময়ে সংস্করণ করিতে লাগিলাম।

অযোধ্যায় গমন। সাধুসঙ্গ।

সকলের পরামর্শ মতে আমি আর কালের না করিয়া বৈষ্ণবের পর্যন্ত ফয়জাবাদে বৈষ্ণব হইতে বড় দাদার নিকটে চলিয়া আসিলাম। অযোধ্যায় ৫০৫ মাইল অন্তরে এক মাস, ১২১৬। ফয়জাবাদে বড় দাদা এই যুগুক হরকা ভূম্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সরকারী হাসপাতালে অস্থিতি করিলাম। একাউ হাসপাতালে তথার অন্তর্গত কম্পাউন্ডের এক পাশে সুন্দর একখানা দোতলা বাড়ীতে দাদার বাসভবন। দাদার সঙ্গে আমি পরমাণুতে দিন কাটাইতে লাগিলাম। হাসপাতালের কাজ বাদে অবশিষ্ট সময় দাদা ধর্মালোচনা লইয়াই থাকেন। দাদার সঙ্গে সকলই উচ্চপদস্থ ও ইংরেজী ধরণে সুশিক্ষিত হইলেও,
কলিকাতায় গৌসাইদর্শন। সাধুমহাশয়দের সঙ্গবিবরণ।

কয়েক মাস এখানে থাকার পর গুরুদেরকে দেখিয়ে প্রাণ লম্বা অতির হইল। আজ মাস, এ সময়ে ভগবানপোস্ত, পারিবারিক কোনো বিশেষ প্রয়োজনে দাড়াও ১২৯৬। আমাকে বাড়ী পাঠাইতে বাট হইলেন। আমি বাড়ী রওনা হইলাম।

কলিকাতায় আসিয়া শনিলাম গোবাজীর মহাশয় কলিকাতাঘরে আছেন। গুরুদের সঙ্গ-বিবরণের লোভে কয়েকদিন কলিকাতাঘরে থাকিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। আমারপৰ্য্যন্ত মেঝ ঢাকার বাসায় রহিলাম।

লাগ্য অপরাজে গোবাজীর মহাশয়ের দর্শন-মনসে বাহির হইলাম। ভুকিয়া ক্রীড়ার উপরে হেু একথায় দোভালা বাটীতে তিনি রহিয়াছেন। স্বধর, শামাকাস্ত পতিত মহাশয়-প্রভূতি শিষ্যগণ এবং গোবাজীর পরিবার সঙ্গে আছেন।

গৌসাইয়ের কাছে পৌছিয়া দেখি, লোকে যে পরিপূর্ণ; ভক্তিভাজন ব্রাহ্মচর্য প্রচারক, শ্রীযুক্ত শিননাথ শাক্তী, শ্রীরাম নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভূতি গণশ-মাণ্ডল ব্যক্তির গৌসাইয়ের
সহিত ধর্মালাপ করিতেছেন। শিবনাথ বাবু তার একটি অবস্থার বিষয় ব্যক্ত করিলেন।
গোসাই মহাশয় শুনিয়া বলিলেন,—যট্টচুক্তভোগী মহাশয়ার যে অবস্থায় থাকেন, শিব-
নাথ বাবু উপাসনাকালে কখনও কখনও সহভাগ্য অবস্থান করে তাহা তোহে করেন।
এটি বড় সহজ নয়।
গোসাই মহাশয় আমাকে দেখিতে পাইল, ডাকিয়া সমুদ্রে নিয়া বসাইলেন; এবং
বলিলেন—কি ? তুমি অযত্থা থেকে এলে ? ওখানে সময়ে সময়ে তাল তাল।
সাধু মহাশয় দর্শন পেয়েছ তা?
আমি ! —ইহো, কব্যকাজন মহাশয় দর্শন পেয়েছিলাম।
গোসাই ! —ঠাকুরের সম্ভক্ষে যে তোমার জানা শোনা আছে বল।
আমি সকলের সাক্ষাতে বিভূতরূপে বলিয়াছিলাম।

ল্যাঙ্কা বাবা।

ফরজাবাদে আমি করেক মাস ছিলাম। এইসময় মধ্যে ৩৪ টি মহাশয় দর্শন পাইয়াছি।
আমার অযত্থ যাওয়ার পূর্বে দালার পত্রে লাঞ্জ। বাবা কথা শুনিয়া আপনাকে আমাইয়া-
ছিলাম। আপনি তখন বলিয়াছিলেন—“ইনি একজন খুব শক্তিশালী সিঙ্গ পুরুষ।”
ফরজাবাদে যাইলা আমি প্রথমে এই মহাশয়কে দর্শন করি। ‘গুণ্ডার ঘট’ হইতে এক কি
২ মাইল অন্তরে, সর্বজন পারে, জনমানব যুগল স্বভাবর মাদানের মধ্যে ইনি থাকেন।
রামনিকৃত মাটি পাহাড়ের মত ভূগোলিত করিয়া দোকানের ভাঙ্গা ৩ টি ঘাঁক করিয়াছেন।
সর্বোচ্চ ঘাঁক সমতলভূমিতে প্রায় ৫০ যুট উচ্চ হইবে। তাহারই উপরে মুক্ত
অকাশের ন্যাচ ল্যাঙ্কা বাবার আসন। এইসমস্তহই বহুদুর পর্যন্ত গাছ পাড়ার কোনও
সম্পর্ক নাই। চতুর্দিকে ঘাসের মস্তান মাত্র দেখা যায়। গুণ্ডার ঘাঁক বা ক্যান্টনমেন্টের
নিকটবীরে ঐ দিকে তাকাইলে মোটা ঘাসের উপরে বাবাজীকে একটি পশ্চাত ভাঙ্গা দেখা
যায়। উহার প্রায় তাহে মুক্ত সরষ্ণ তেজ; অপর তাহের কোন তুটু প্রকাশ নাই।
এই মাটি
সর্বজ্ঞ চতুর্দিক হইতে পাড়ে। একটি সর্ব ঘাস সরষ্ণ একদিক হইতে আসিয়া, ল্যাঙ্কা বাবার
আসনস্থান বৈষমপূর্বক অপর দিকে গিয়া। আবার সরষ্ণেই মিলিয়াছে। উহাতে অল খুব
আল থাকে। গুলিয়া—একবার এই ঘাসের আলোক বৃষ্টি হওয়া, উঁাহা শুষ্ক হইয়া ক্রমে
ল্যাঙ্কা বাবার আসনস্থানের নিকটবীরে হয়। তখন বাবাজী বাবাবর্জন খালটিকে বলিলেন—
নামি, ঈদার মন আও। কিছু পালটি ক্রমশই রুজ্জি পাইকে লিলিয়ে। পরে বাবাজী বিকুঠে হইয়া বলিলেন—'হা! মাসারা? আছে, বন্ধ হচ্ছি যাও।' সেইহইয়েই নাকী খালটি একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সহরের লোকে সকলেই বলে, 'বাবাজী লজ্জপূর্ক, তাহার বাক্যেই খালের ঐ দশা ঘটিয়াছে।'

শীত ও গভীর ফজরবাদে অত্যন্ত বেহুলা। পোষ মাধ মাসে কোঠারের ভিতরেও শীতের সময়ে আগুন ভালীয়তে হয়; আবার গৌরীর সময়ে বৈশাখ ভূষার মাসে বেলা ১ টার পরে ঘরের বাহির হওয়া যায় না; এ মিনিট বাদে পাকিলেই মনে হয় যেন শরীরের প্রতি ফনা পড়ে। ল্যাঙ্গা বাবা 'গুপ্ত' ময়দানের মধ্যে অনান্ত হলে দারুণ শীত গৌরীর কিছু উপরে অবলম্বন না করিয়া কি প্রকারে উল্লাসগায় অহিনশ থাকেন, তাহার আবার হইগাম। লোকালয়হই এই তফাতেই বা কেন আসন করিলেন, জানিতে যে বোঝাল জ্ঞান। এক দিন বাবাজীকে কিছু করায়, তিনি তাহার জীবনের অনেক কথা বলিলেন। শুনিলেম, তিনি বহুকাল তীব্রপরিত্যক্ত করিয়া, অবশেষে ফজরবাদে শুভ্র ঘটে আসিলে উপনিত হন। লোকালয়হই দুই থাকা তাহার নিয়ম বলিয়া এ ময়দানেই গিয়া তিনি আসন করিয়া বসেন। একদিন গভীর রাতে সমুদ্রে ধুমি বাড়িয়ীর নাম করিতে করিতে তোলাবাদে অলস অগানের উপরে পড়িয়া গান, তাহাতে খরের কয়েকটি গ্রাম সাংঘাতিকরণে দগ্ধ হইয়া গয়। বাবাজী পোড়া ঘাটের আগাছে ছুটিয়ো করিতে করিতে চীৎকার করিয়া কাতরভাবে রামজীকে ভাবিয়া বলেন—'হা রামজী, তোহ্যাকে লিখে মে এখান। কিন্তু আওর তুমে। এই হাল কিয়া! বাবাজী এইখানে বলামাত্র দেখিতে পাইলেন আকাশগতে তীর্থপার্থে একটা কি যেন শের শঙ্কা আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই মূর্ত্তি বাবাজীর সমুদ্রে আসিয়া পড়িল এবং বাবাজীকে সবাই ধরিয়া অলস আগানের উপরে ফেলিয়া যেতে লাগিল; অন্তপর একোবারে নিকান হইলে পরে, ধুমির বিভূতি তুলিয়া বাবাজীর সর্বাঙ্গ মাষাইয়া দিল। আতঃপর সেই আকির্তালী নফসন বলিয়া—ইহাই রহ; আসন কেন মঃ ছেড়না। কোথি উপাধি পর্যন্ত নেই, করেন। সিক বন্ধ যাও। বাবাজী সেই হইতে আসন ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই। এইখান বাবাজীর উপর ভরসা পরিবার গিয়াছে।

গোলাই বলিলেন—সে কিরকম?

আমি। বাবাজী যে ময়দানে থাকেন, ফজরবাদের ক্যানিংগুটু তাহারই এক পাশে। বিভূতি প্রকাও মাথা বলিয়া, উত্তরপশ্চিমকেলের গোলাই সেনাদের গোলা—
বাজী তেই মাঠেই হইয়া থাকে। গোলাগুলি ছুঁড়িবার পূর্বে ময়দানের সমীপবর্তী আলিয়া-সমুহে নোটিশ দেওয়া হয়। চাঁদের দিনের জ্যোতি তখন সকলকেই আঘাত সরিয়া বাধিতে হয়।
একবার এই কাটাধা গোলাবাজীর পূর্বে নোটিশ পড়িল। সকলে বাজীর ছাঁড়ি আঘাত গেল; কিন্তু লাঙ্গা বাবা আসন ছাড়িলেন না। সরকারী তরফ হইতে তাহাকে ঐহংক ত্যগ করিয়া বাধিতে পুনর্গঢ় বলা হইল। বাজী বলিলেন— 'বাচ্চা লোক, খেলা কর। আসন হামারা সিদ্ধি, হায়, ছোড়নে নেহি দেখিতে। কুচ হোগা নেহি; তুমি খেলা কর।' শুনিলাম অতঃপর সরকার হইতে অনেক ভয়ে প্রদর্শন করা হইল; কিন্তু বাজী, আসন ছাড়িলেন না।
পরে হঁচুনি হইল—নিদীড় সময়ের মধ্যে বাজী না সরিলে তাহার মৃত্যুর জন্য সরকার দায়ী হইবেন না। যথাকালে গোলাগুলি ছোড়া। আরম্ভ হইল—সমগ্র ময়দানটা অধিষ্ঠাত হইয়া গেল, বাজী আপন আসনে প্রবেশ করিয়া ঢুনি আলিয়া বসিয়া রহিলেন।
কর্নেল কলী কিছুক্ষণ অন্তর অস্তর দুরবীহের এক একবার দেখিলে লাগিলেন বাজী জীবিত আছেন কি না। অসংখ্য গোলাগুলি ছোড়া হইতে লাগিল, এদিকে বাজী চোখ নিজের বামহব্দান। চালানত সময়ে ধরিয়া রহিলেন। গোলাগুলি সমস্ত বাজীর দক্ষিণে বামে এবং মাটিকের উপর দিয়া। অবশ্য চলিয়া বাণিজ্যে লাগিল; কিন্তু বাজীর কিছু কিছু হইল না। ইহা দেখিয়া কর্নেল কলী স্তুতিত হইলেন।
পরে সব শেষ হইল। গেলে, তিনি বাজীর নিকটে আসিয়া সমস্তে পুনর্গঢ়ে সেলাম করিয়া বলিলেন— 'বাবা, গোলাগুলি রয়েছে এই অবস্থায় মনে থাকিতে দেখিয়া স্তুতিত হইয়াছি।' শুনিলাম, একেবারে সকালের যে পৃথ্বী খেলা থাকে তাহার এই ঘটনাগুলি সাদৃশ্য লিখায়া।

gosaip——লাঙ্গা বাবা 'মহাশক্তিশালী পুরুষ; কামানের গোলায় তাঁর কি করবে? আজকাল একমাত্র শক্তিশালী লোক বড় দেখা যায় না।
gija sa koli——ওভাবে লাঙ্গাবাবা নিকটে কে এসেছিলেন? কে এসে তাহাকে সিঙ্গক করে গেলেন?

Gosaip. ভক্তরাজ মহাবীর এসেছিলেন। তাঁরই 'বরে' লাঙ্গা বাবা সিঙ্গ হন।

Akh. মহাবীর এলেন কেন?

Gosaip. রামের নামে দীর্ঘনিশ্চয়! রামভক্ত মহাবীর কি স্ত্রীর থাকিতে পারেন? বাবাজী তোমাকে কিছু বললেন?
প্রথম খণ্ড। ।

“আমি। বাবাজীকে দর্শন করিতে আমি প্রায়ই যাইতাম; সাধারণতঃ বিখ্যাত ভক্তি
লাই হউক এই অশীর্ষ্টাদি প্রথাচুর করিতাম। অশীর্ষ্টাদি চাহিলে বাবাজী চর্চিতা উঠিভেন;
মাধ্যম হার বুলায়ে খুব স্নেহের সহিত বলতেন—“আসে তোম তো। ভবানীকে আশ্রয় লিয়া
হায়ু।” গুরুজী তোমারা বড়ো দয়াল, বড়া দয়াল। নালিক তো। ওহি হায়ু। বিখ্যাত ভক্তি
দেনেওয়ালা ওহি হায়ু। পুরী বন যায়েছা। আনন্দ কর, আনন্দ কর।”

বাবাজীর শরীরের চর্চা হাতীর চামড়ার মত দুর্দৃষ্টি ও খসথেস। দেখিতে কুত্তিগীর
পালোরার মত কীর্তির্পঙক্ত।

পতিতদাস বাবাজী।

ফরজাবাদে যাইহার দাদার মুখে শুনিলাম—বহুকালের একটি প্রাচীন মহাপুরুষ
অবতারের পথে কোনও একটি নিঃসৃত উত্তম আছেন; কিন্তু তাহার দেখা পাওয়া বড়
কঠিন। পূর্বে কখনও কখনও একক্রমে হইয়া মাস কাল তিনি একান্তে আহার নিত্য
ত্যাগ করিয়া সমাধিত্ব ধারিতেন; অপর হইয়া মাসের মধ্যে কোনও কখনও নিঃসৃত সময়ে
সাক্ষাৎ তাহার দর্শন পাইত। আজ কাল তিনি তিন মাস অন্তত তিন মাস সমাধিতে
থাকেন। আমি লোকপালনের জন্য বাবাজী একের সমাধিতে নাই; স্বতঃস্ফূর্ত
তাহাকে দেখিতে হয়েছ। ঝড় হইলাম। দাদা আমাকে বাবাজীর দর্শনে যাইতে পুঁথ পুঁথ বাধা
দিতে লাগিলেন; কারণ বাবাজীর ভজনকুটীরের ধার প্রায়ই বদ্ধ থাকে এবং নিঃ
হইতে কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা না হইলে সচরাচর কেহ তাহার দর্শন পাই
না। যাহা হউক, অতঃপর আমার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া দাদা আমাকে সমভি
পদান করিলেন এবং আমি উঞ্জ্বক্কিচে বাবাজীর দর্শনে বাহির হই। পরিলাম।
ফরজাবাদচুড়ে। অবতার যাইতে প্রত্যেক মহাকালের সমুদ্রে রাত্রি হই দিকে গিয়াছে।
একটি দক্ষিণে দেওকালীর দিকে, অপরটি বাদে রাগুপালীর দিকে। এই রাগুপালীর রাত্রি
বামপাশেই বাবাজীর অস্থায়।

আমি ধীরে ধীরে আশ্রমে আঘাত করিয়া দেখি বাবাজীর ভজনকুটীরের ধার বদ্ধ।
বাবাজীকে উদ্দেশ করিয়া বাহিরহইতে আমি একটি সাধারণ প্রথার করিলাম। মাথা তুলিয়াই
দেখি বাবা জী দরজা খুলিয়াছেন। আমাকে খুব সমৃদ্ধ ভাবিয়া বলিলেন—“আও
বাচ্চা, আও, ইহার বেঠা। খেলন্দা আগাড়ি হামারা মনুষ্য পড়া, তোম ইহার আওগে,
তবু হামুভি তোমারা ওঠাঙ্গে বেঠা রহ।” বাবাজী একবারে আমার দিকে চাহিয়া
রহিলেন। কিছুকাল অন্তর অন্তর এক একবার শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়া লাগিলেন—
“আঃ! ধর্ষ হো গিরিয়া! ধর্ষ হো গিরিয়া! চর্চিত সাধারণ আমার পায়! ধর্ষ হো গিরিয়া! ”
বাবাজীর উচ্চাস একটি কথিতে অধিবলিষ্ঠ—‘বাবা, আমার কলাণ কিসে হইবে?’
বাবাজী খুঁখ উঠানের সহিত আমার মাথায় হাত বলাইয়া বলিলেন—‘আমার ক্যা বাচ্চা?
সব তো পূর্ণ হো গিরিয়া। ওহি কালাকে খান করু। খুব আনন্দ করু।’ অনেককাল
বাবাজীর নিকটে বলিয়া ছিলাম। তিনি অবিশ্বাস্ত কেবল কাদিলেন, আর থামিয়া থামিয়া ঐ
একই কথা বলিতে লাগিলেন। বাবাজীর শরীরটি ঘুঁ প্রাচীন বলা প্রায় সমস্ত বৎসর ;
আকৃতি অত্যন্ত দীর্ঘ; বর্ণ, মুখটি গোলাপের মত লাল, মাথি গোল্ফ চূল সমস্ত
সাদা; হাতপায়ের নথগুলী লম্বা হইয়া বড়লোকের মত বাকিয়া গিয়াছে। কথায় কথায়
টাস্ট করিয়া চক্ষুর ঝল পড়ে। দেখিয়া বড় আনন্দ হইল।

gোসাই বলিলেন—“পতিতদাস বাবাজী তারিক সাধন করে সিদ্ধ। ইনি
মহাপ্রেমীক। তারিক সাধন করেও, দেখু লোক কেমন প্রেমিক হয়।
এ সব লোকের দর্শন সহজ নয়। রঞ্জমহলে হনুমানু গোলাইয়ে কেন সাধুর
দর্শন পেয়েছে?”

গোপালদাস বাবা।

একদিন অক্ষরাত একটি সাধু আসিয়া দাদাকে বলিলেন, “বাবু সাহেব, রঞ্জমহলে
একটি সাধু কাজের বর্ণনা কৈ বাইতেছেন। আপনাকে আনাইয়াম; এখন তুমিকে
দেখা না দেখা আপার ইচ্ছা। সাধুর টাকা পরা নাই। আপনার ‘ভিলিট’ বা
অন্যহই যাওয়া আসার গাঁজিভাড়া। তিনি দিতে পারিবেন না।” দাদার এ কথা পুনমাত্র
সাধুর কিছু বাইতে অহির হইলেন; অনন্ত একখান গাঁজী আনাইয়া আমাকে সঙ্গে
লইয়া অল্পদিন রওনা হইলেন। অক্ষরের মধ্যেই আমরা বাহরাতে গোস্তিলাম, এবং
রঞ্জমহলে অনেকগুলি কাম্রু ঘুমিয়া আমরা একটি অদৃশ্য কুটুম্বেতে একবেল করিলাম।
এ ঘরের পার্থক্য সাধুর নিচে একটি গোক হইতে একজন বৃদ্ধ সাধুর বাহির হইয়া
আসিলেন। কাজের ভিতরে তুমিকে অনেক সময় অপিরাহিল; দাদার তারা সাফ
করিয়া দিতে বাইতে উপশম হইল।

বাবাজীকে দেখিয়া বড়ই বিশ্বাস হইলাম। শরীরের অবস্থার কৃষ্ণ, মনে হয় যেন
অহির উপর চর্চমাত্র রহিলে। চর্চার রং অন্তরাজিক সাদা—ঠিক চুদে মত। মৃদুশ্রী
ফিন্দ বেশ পুষ্ট, খুব উজ্জ্বল ও তেজস্পৃক্ষ। সর্বোচ্চ ঈশ্বর হাসি যুথে লাগিয়া রহিয়াছে। শুনিলাম বাবাজীর বর্ণন দেওনোতেও অধিক। কত কাল বাবু যে তিনি, ঐ অন্তরাল গোকুলে আছেন, রঙ্গমণ্ডলের বৃহ সাধুরাত্য তাঁর জানেন না। তিনি সমন্ত দিকে একাকার মাঝে, শেষ রাতিতে, পৃচ্ছায় বাহির হন। রঙ্গমণ্ডলের সাধুদুর্য বৎসরে একাকার দর্শন ঘটিয়া উঠিল না। সর্বদায় তিনি ঐ গোকুল মধ্যে অবস্থান করেন।

আসিয়া সময়ে বাবাজীকে সমকাল করিয়া আশীর্বাদ চাহিলাম। বাবাজী কর্জোতে গদগদ ভাবে কহিলেন, “রামুঞ্জ বড়ো দলাল, বড়ো দলাল। উন্নিত নাম লেকে উন্নিত। স্নানে পড়া রহা হয়। আবু যে করে রামুঞ্জ। বাচা, বহু ভাগ্নে রামুঞ্জকা আশুর পায়। আবুর্দ নাম করে৷ আওরা আনন্দ করো।”

তুলনীদাস বাবু।

আমি আবার বলিয়া লাগিলাম—আনুধায়ে সরযুর তালে একটি মহীরে বাবা তুলনীদাস থাকেন। আনুধায় ও বৰ্ত্তমান সাধুদুর্য মধ্যে ইনি খুব প্রসিদ্ধ। দর্শন করিতে যাইয়া দেখি, বাবাজী নামশেষে মন হইয়া আছেন। মনুষ্য ও উভয় পার্শ্বে বহু লোক হস্ততাবে বসিয়া বাবাজীকে দর্শন করিয়েছেন, কিন্তু বাবাজীর কোনও দিকে আক্ষেপ নাই। এক একবার সনে তথাহইতে চমকিয়া উঠিয়া সকলের প্রতি চেষ্টাই করিয়েছেন, আবার চলিয়া পড়িয়েছেন। বাবাজী দাড়ায় দেখিয়া খুব আদর করিয়া সন্ধ্যে বসিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং খুব প্রসন্ন মুখে আনন্দ হয়। জিজ্ঞাসা করিয়া আবার জেনে মন হইয়ে। বাবাজী মালা জগ করেন; কিন্তু মালার সঙ্গে মানুষ করেনই সন্ধ্যা, মনে হইল; মনটি বেন কোথায় থাকিয়া গিয়াছে। বাবাজী কাহারকে নাকি কোনও উপদেশ দেন না। তথু নাম কর, নাম কর’ এইমত বলেন।

অন্ধ বাবাজী।

গোসাই জিজ্ঞাসা করিলেন—আর কোথাও কাহাকে দেখিলে?

আমি। ফরুশাবাদে বেগমগঞ্জে গোপনে একটি মহাবীর আছেন—জেল-বারেগা। নন্দ বাবু আমাকে জানাইলেন। তিনিই অমৃত করিয়া আমাকে সাধু বাবার নিকটে লইয়া গিলেন। এই সাধুরূপে খুব রূপ; পুরুষ তিনি এক রাজার মনে ছিলী। রাজা-সিংহস্তে কোন বিষম অনর্থের স্বচ্ছন্দে দেখিয়া ইনি পলায়ন করেন। পথে কোনও অমৃত্থক বিপদে ইহার দুইটি চক্ষুই নষ্ট হয়। একটি ভ্রমলোকের কুপায় পরে ইনি অনুৱায়ে আসেন, তাহাই আশ্রয়ে
খাকিয়া বলিলেন— হনুমানের গোরী ধরিয়া জাগ্রত হইল। ওখানে সেই মহাপুরুষের আসেন। কিন্তু ঠাকুর আপনাহত পরিচয় না দিলে কেউ ঠাকুরের ধরতে ছুঁড়ে পারে না। ঘটার ঘাট আর হনুমানের গোরী এই দুটি স্থানই এখন পর্যন্ত ঠিক আছে। প্রাচীন অযোধ্যার আর সবই সর্ব্ব আসে করে নিয়ে নাও না।

গোর্ণানী মহাশয়ের সঙ্গে বহুবার পরে আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম। কয়েক দিন কলিকাতায় থাকি যার উপরের সঙ্গে এখান পরিচিত হইল।

যোগজিয়েন ও শাস্তিমূৰ্ত্ত পরিণয়োৎসব।

গত কয়েক দিন আমি গোর্ণানী মহাশয়ের নিকটে ছিলাম না। স্থতরাং তৎকালীন তাহার কার্যকলাপের বিবরণ আমার এ ভাবের বাদ পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার গোর্ণার কিছুকাল থাকি। ঘুরাতাদের মুখে যারা যারা আসিলাম, তাহা সংক্ষেপে এমন লিখিয়া বিচিত্র ছিল। যদি কখনও গোর্ণানী মহাশয়ের নিজস্ব ইনি সকল বিষয় গুরুতে পাই, বিষাদে বিশ্বাস বিচিত্র যাইব।

গোর্ণানী মহাশয় তাহার পুত্র ও কন্যা শ্রীযুক্ত যোগজিয়েন গোর্ণানী ও শ্রীমতী শাস্তিমূৰ্ত্তি দেবীর পরিচয় কার্য্য শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী ও তাহার জ্ঞেয় সহধর্মী শ্রীযুক্ত রণজিৎ মৈত্রের সহিত ১২৯৫ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারী সম্পর্কে কথিত ছিল। আধুনিক ভাবের সুশিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত সন্তিসন্ধির কোন বর্ণে পরিবারের উহাদের বিবাহ দেওয়া গোর্ণানী মহাশয়ের পক্ষে কিছুই করিতে ছিল না। কিন্তু বীর গুরু পরমহংসজীর আদেশে তিনি কোন বিষয়ে লুণ্ঠন না করিয়া। বহ আর বিষয়ে সন্ত ও নিজ পরিবারের ঘোষ প্রতিবাদ এবং আপত্তি সম্বন্ধে এই কার্য্য অনন্দের সহিত সুস্পর্শ করিয়াছেন। অনান্ত পূর্বকই
গৌরাভী মহাশয়ের নিকট লীলাকালি করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মণমাজের পক্ষে অসহায় এই বিবাহ-কর্ত্তা নিধস্ত হইয়াছে। চাঁদর প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ইশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গৌণাইনীর ভক্ত ছিলেন। গৌণাইনীর মহাশয়ের একজন শিষ্যকে দেখা লইয়া তিনি একদিন আসিয়া বলিলেন, 'এখন আত অভ্যন্ত বিবাহ দেওয়া কেন? হিন্দুবিবাহ আহরণের পথের গবেষণা হইয়াছে, অতএব হিন্দুমত বিবাহ দিলে হয় না?' গৌণাইনী মহাশয় তাহাতে বলিলেন, "তাল কথা," কিন্তু এই দিন পরেই তাহার গৌণাইনীকে হাসিয়া বলিলেন, "আমি বুঝি দেখাতে হয় হিন্দুমতে এই বিবাহ হবের পারে না। তাহার একটি সংক্রান্ত্যে তাহার পরিচয় নাই; জগবন্ধুও নানা আচার করেন। এই তাহার প্রায়শই হওয়া কঠিন, আর তাহার সময়ই বা কোথায়? তোমরা কি মনে কর না। তাহার পক্ষে তাহার বিবাহ দিতে হবে।

ভক্তিভাঙ্গ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় স্বয়ম্ভু গৌণাইনীর পুত্র ও কন্যা বিবাহে পোকের ধ্বনি করিয়াছিলেন; বিবাহের গৌণাইনী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন; গান্ধী দ্বীপসম্পর্কে তিনি যেকয়ে অপূর্ব সারগর্দি ও শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় গ্রাহ করেন, তাহী প্রভৃতি করিয়া সকলেই উপকৃত ও বিমৃদ্ধ হইয়াছিলেন। পুত্রের তিনি একবার কল্যাণচর্চা গ্রাহনের আদেশ করিলেন। গৌণাইনী-অশ্রমে একদিন গ্রাহণ আদেশ দিলেন। পাঠার রোধ বোধ এবং অপর কর্মকর্তা নিউক্সের অধিমান হইয়াছিল। বিবাহের পরিসমূহ বিবাহের রোহ হইয়াছিলো, এই বিবাহে সাধু সত্যানন্দের সমাবেশে কেবল দিন আনন্দোলন চলিয়াছিল, এবং তাহাতে শ্রীযুক্ত গৌণাইনী মহাশয়ের কয়েকটি লোকবিদ্যাকর যে কিছু অক্ষয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাহাতে একক সম্মান সহিত তাহার সম্ভাবনা লিখিতে আরও ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবিদের পাগলামী ও ঠাকুরের শাসন।

গৌণাইনী-অশ্রমে অবস্থানকালে কিছুদিন শ্রীবিদের পাগলামী অভিষেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সে সময়ে গৌণাইনীর দিয়ে তাহার লোকচারণী বিভিন্ন আচার, তাহার লোকচারণী বিভিন্ন আচার উত্তপ্ত হইয়াছিল। উহার কন্যাদের শ্রীবিদের উপাসনা এককালে শাসন করিয়া বিবিধ ব্যভিচার উঠিল করিয়া।

গৌণাইনী মহাশয়ের সেকল প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তির নিদর্শন চক্ষের সমুদ্রের সত্যই জানিতে
পারিয়া, উহাহইতে উহাঙ্গিকে বিরত করিতে ভঙ্গ শীর্ষরের উপরে ভঙ্গর কঠোর শাসন করিয়াছিলেন; এমন কি, শীর্ষরকে স্বান্তরিত করিবার জন্য, গোমোরীয়ার সকলের উহার সঙ্গ তাঙ্গ করিতে এবং আহার না দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। শীর্ষর, কখনও বা অনাহারে, কখনও বা সৌধার্থ শীঘ্রতা যোগারি। ঘোষের প্রস্ত হই এক মুষ্টি অন্ন আহারে, গাছ্তলাম পড়িয়া থাকিয়া, কোন প্রকারে দিনের পর দিন কটাইতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি গোমাহি মহাশয়রের আশ্রয় তাঙ্গ করিলেন না। দুঃখ অতিশয় তীব্র হওয়াতে শীর্ষর বাচিয়া গেলেন। শীর্ষরের চর্দা বেদিয়া। আহার শর্করণের দণ্ড হইল। আহারী শেষে গোমাহি মহাশয়ের নিকটে আসিয়া এ যাত্রা শীর্ষরকে কমা করিতে অনুরোধ করিলেন।

ধুলটোৎসব।

(আমার অনবধানতা প্রয়ূর নিমিত্তবাধিত ঘটনাটি ধারায়নে সরবোত্তম করিতে পারি নাই।)

একরামপুরের বাসায় একদিন গোমাহি মহাশয় কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—'‘এবার ধুলট উৎসব করিলে হয়।' গুজরাটারের মধ্যে অনেকেই ধুলট। উৎসবের নাম পর্যায় ভুনেন নাই। শীর্ষরক্ত অভিষেক আবিভাব তথি মার্জি-সুমাজিতে শাহশাহীরে প্রতি বৎসর প্রায় একবার কাল এই উৎসব হইয়া থাকে। দোলের সময় কাগ থে ভাবে ব্যবহার হয় এই উৎসবে সংকীর্ণনকালে সাতার ধুলিমাঝি সেইঠাপে উড়েন হয় বলিয়া হইয়া নাম 'ধুলট' হইয়াছে।

করছড়ির পরে শীর্ষর কুঁড়িবিহারী কোথা মহাশয়ের বাড়ীতে গুজরাটারদের একদিন নিমগ্ন হইয়াছিল। ভোজনেতে শীর্ষর দুর্গচরণ রায় মহাশয় বলিয়াছেন 'ঠাকুর যখন ধুলটের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন এই উৎসব করাই চাই। বায় নির্ভরের অঞ্চল সকলে কিছু কিছু করিয়া দিন।' তখনৈ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইয়া লাগিল এবং গোমাহি মহাশয়কে জানান হইল যে এবার ধূলট করা হইবে। এই সময়ে শীহট হইতে অষ্ট বাবাজী আসিয়া ঢাকাতে উপনিবেশ হইলেন। তিনি গোমাহি মহাশয়ের আবালেই অবহমান পুরক্কু হইয়া গান-বাজনার মাধ্যমে সকলকে মুষ্টি করিতে লাগিলেন। বাবাজী পদার্থ গান করিতে করিতে আশ্রয় প্রাকারে নিজেই গোল ও করতল একসঙ্গে বাজাইয়া থাকেন। মাটিতে একশান করতল তিন করিয়া রাখিয়া আপর খানা বাহিতে গুলাইয়া দেন, পরে গোলের তালের সঙ্গে সঙ্গে বাছ নাড়ার কোলে করতলও তালে তালে বাজিতে থাকে। ধুলট উৎসবের করছড়ির পুর্বচ্ছিন্নতে অষ্ট বাবাজীর অপূর্ব কীর্তন গানে আগ্রহে সর্কাবল অনন্ধােচ্ছাস চলিতে লাগিল।
প্রথম খণ্ড

[লাল বর্ণনা]

এদিকে মায়ে-সন্ত্রাং তথ্য আসিয়া পড়িল। বলা পার আটটার সময়ে শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবু বিধু বাবু এবং প্রসেস মহুয়েদার-প্রভৃতি বাসার অপর পার্শ্বের কক্ষগুলায় * গোসাইকে সমুদ্রে 

রাখিয়া গান আরম্ভ করিলেন—

হরি বলব মুখে, যাব মুখে ব্রজনাথ
কিতে তার রচনা হরিনাথ। —ইত্যাদি

গোসাই মহাশয় রাস্তায় পড়িয়া সালাহাঙ্গ প্রণামাঙ্গ ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

পরে উঠিয়াই ছই হেতু ধুলি লইয়া 'জয় সীতানাথ' 'জয় সীতানাথ' বলিয়া বলিতে উহা চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পশ্চিম সংযুক্ত ধুলির সম্পর্কে মুক্ত মধ্যে সকলেরই ভিতরে এক অভিযুক্তপূর্ব তারের সংখ্যার হইল। দেখিতে দেখিয়া তাহারা ভাবিুমান অবহ্বায় হইত, গর্জন ও ধুলি উৎক্ষেপণ পূর্বক উদ্দো নৃত্য করিতে করিতে গোসাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে 

লাগিলেন। এই সময়ে কয়েকদল কীর্তন অক্ষরাং স্মৃতি সংকীর্ণে যোগদান করিল।

তখন মৃদঙ্গ করতলের ধরনী সংকীর্ণে-কোলাহলে মিলিত হইয়া চতুর্দিক কোলাহল তুলিল।

গোসাই মহাশয় উচ্চ উচ্চ লক্ষ্যপূর্বক নৃত্য করিয়া চিন্তন ভাবিবিষ্টি হেতু করেক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই তিনি রুদ্ধগতি হইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে উচ্চ আনন্দের এক হলন কাও আরম্ভ হইল। প্রথম তারের অপুর্ণ তুষার উত্তরাধিকারী জীবন পাইয়া অপুর্ণ ধূলিরাশির সংস্পর্শে দর্শন মুখোপদেশ অভিভুক্ত করিয়া ফেলিল।

স্ত্রীলোক পুরুষ, বালক রুচি, মূটে মজ্জুর, বাসদাদর প্রভুর প্রতি যে অবহ্বায় ছিলেন রাস্তার উভয় পার্শ্বে ভাবিতে তিনি সেই অবহ্বায়ই মল মুক্ত রহিয়া গেলেন। কোন কোন অন্ত্যেবার উপরে মহিলা দিশায়ার হইয়া সংকীর্ণি হলে লাফাইয়া পড়িতে উঘোষ করিতে 

লাগিলেন, শিক্ষিতলাল হানে হানে মুখচীৎ হইয়া পড়িল।

এই মহাসংকীর্ণ এতই দীর্ঘতায় অগ্রসর হইতে লাগিল যে পাচ সাত মিনিটের পথ স্ত্রীবিহারীসাগরের মধ্যে উপস্থিত হইতে তিনি ঘটিকাল কাটিয়া গেল। এই প্রকারে সংকীর্ণি মুতাপুর, ফরাসাগর, বাঙ্গালাবাজার, পাটুলি, শাখারিবাজার এবং লাল্লাবাজার ঘুরিয়া আপ্রান্ত তিনটার সময়ে একরামপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বাতার দায়ে অদ্যাৰে আসিয়া গান ধরিলেন— 'নসর ভ করে আমার গৌরে এলো দেখে, আমার

* কথিত আছে যে শ্রীমরিমানি অনুষ্ঠান পুত্র শ্রীযুক্ত বলভুঙ্গ ঠাকুর ঐ হাতে একটি কদম গাছের তলায় তাহার আলাদা স্থান করিয়া কিছুকাল সাধন অর্জন করেন। সময়ে ঐ পূজাতন কদম রুক্ষ নষ্ঠ হইলে সেই বয়সেই ঐ একটি কদম রুক্ষ জন্মিল। এই ভাবে অদ্যাৰে বলভূঙ্গের আসন-হাত রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।
নিতাই এলো ঘরে—' এই সময়ে উদীপিত ভাবের অভিনব উচ্ছাসে সকলেই পুনরায় উদ্বিগ্ন হইলেন এই ভাবে বহুক্ষণ চলিয়া গেল। ক্রমে সংকীর্ণ ধারিলে জনসমূহ চলু চলু অবহ্মার শান্ত ভাব ধারণ করিল।

এই বিচিত্র ভাবোয়াদিকারী ধূলতোৎসবের নগর-সংকীর্ণে ঢাকাবাসীর। অভিশাপ মুখ হইয়াছিল। একটি অল্পবয়স্ক বালক ১০১২ ঘটাকাল সংক্ষেপাত্মক ধারায় তাহার পিতামাতা উহার আবহাওয়ার হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাহারা গোসাইয়ের নিকটে আসিয়া আগুল হইলে কাঠিতে লাগিলেন। গোষ্ঠী মহাশয় তখন তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া স্পর্শ মাত্রে ছেলেটকে হঘর করিয়া চলিয়া আসিলেন। এর একটি জগন্নাথ কুলের ১৪১৫ বৎসরের ছাত্র ধূলতোৎসবের সংকীর্ণে ভাবাবেশে এতই মাত্র করিয়া গেল যে ৩৭ দিন পর্যন্ত সে খাইয়া থাকিয়া রাণার বাড়ীতে 'আমার কুঞ্জ কই' 'আমার কুঞ্জ কই' বলিয়া কাদিয়া ছুটাছুটি করিয়াছিল।

দিবসের অধিকাংশ সময়ই তাঁর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত থাকিত। ছেলেটের নাম শ্রীমন্তীনীকুমার মিত্র। বাড়ী বিক্রমপুর। উহার অন্তরী বল্লভগণ, দীর্ঘকালব্যাপী এই প্রকার অবসান দেখিয়া ভীত হইলেন এবং গোষ্ঠী মহাশয়ের নিকট আসিয়া কাঠে ভাবে উহার প্রতীকারের উপর বিচার করিলেন। গোসাই বলিলেন—"ভবতি বৈশ্ববোনের নিকটে থাকিলে এই ছেলেটির ভাবের আদর হইত। সে যাক; হস্তেই গুলিতে অন্তর্গত কোন পর্য্যন্তকের একটি ভদ্রলোকের কুলবৃহৎ হরিসংকীর্ণে এই প্রকার ভাব হইয়াছিল। বাড়ীর সকলেই তাতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন একটি ব্যবস্থা আসিয়া বলিলেন কোন বাস্তবিক ধার্মিক কৃত্তিকে নিন্মস্ত করিয়া। ভোজন করাইয়া তাহার উত্তাষিত বৃত্তিকে খাওয়াইয়া দিন ভাব ছুটিয়া যাইবে। গৃহস্থানী ঐ প্রকার করিতে বউটির ভাবাবেশ ছুটিয়া গেল।"
লালের বোধিসাত্ত্বের গুরুরাধিকৃতের মৃত্যুত।

শাক্তপ্রবিশালী বালক সাধন লালবিহারী বন্ধুর জাতিসত্ত্ব ও ধর্মজীবনের আচরণ উৎকর্ষলভের সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রবীণতা ও বোধিসাত্ত্ব চতুর্দিকে রাখি হইয়া পড়িগিয়াছে। গুরুধর্ম অনিচ্ছে উহার প্রভাবে মৃত্যু হইয়া গোষ্ঠী মহাশয়ের প্রতিকূলে বেদন দৃষ্টি করিয়া তত্ত্বা অবসর পাইতে পাইতেছেন না। গোষ্ঠী মহাশয় সাধনাপ্রিয়, আর লাল নিত্যানন্দ—এই প্রকার সংসারের কাহারও কাহারও মনে জড়িয়াছে। লালের অসাধারণ শক্তি ও প্রতিকূল গুরুরাধিকৃতের মধ্যে বিস্মৃত হইয়া পড়ায় কাহারও কাহারও অন্যনীহার হৃদয়ের ও শোচনীয় পরিস্থিতির মৃত্যুপাত হইয়াছে।

ভাগলপুরে পুনরাগমন।

কলিকাতায় কিছুদিন খারিয়ার বাসী গেলাম। বৃষ্টিতে আমার বেদনারোগ ক্রমশঃ
অগ্রাহ্যের ১ম বৃষ্টি পায়ে লাগিল। সতরং সেহারে আমার অধিকাকার বিলষ্ট না
গণ্য, ১২৩৬। ফিরিয়া আমার ভাগলপুরে চলিয়া গালিয়া হইলাম।

থানগুরু পুলিনপুরীতে ঠিক গন্তব্যের উপর আমার থাকার ঘর। বস্তকাল রোগ
আজোগা না হইবে এই হারেই থাকিব, সম্পর্ক করিলাম। গোষ্ঠী মহাশয়ের সঙ্গ ছাড়া হওয়াতে এই কালের ভাড়ীর লেখার উৎসাহ একবারে নিবিয়া গেল। আমার কুলিন
জীবনের চিত্র অক্ষর কোন লতাই নাই; যেন যদি তাহার দেখিতেন তাহার অপকারের
অশ্রু আচ্ছন। যদি ওরদের মূলধার সঙ্গ কথন আমার আবার লাল হয়, তথন দুঃখ
পুলিন পুরুষ হেই তীৰ্থ বিপ্লব পাবন-লীলা ভাড়ীরেতে লিখিয়া কুটার হইব। আজহইতে
আমার ভাড়ীর লেখার বন্ধ করিলাম।

বহুদিন পরে ভাড়ীর লেখার প্রবৃত্তি।

আজ বহুকাল হইল নিমিত্তেরপূর্ণে ভাড়ীর লেখার বন্ধ করিয়াছি। এই এক বৎসরে কত
মাস মাসের প্রথম প্রাক্ত অপ্যাত আলিয়া গেল, ভাবিলে স্থির মনে হয়। ওরদের ও
না, ১২৩৬। বার্তীর প্রকাশিত মহাশয় ভাড়ীর লিখিতে আমাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন।
এথেন তাহা শরণ করিয়া কষ্ট হয়। আমার কলুকপুরী জীবনের ঘটন। লিখিতে করিয়ার
অবশ্যকতা যে কি, তাহা আমি জানি না। তবে মনে হয় আমার জীবনের বিশেষ বিশেষ
ঘটনা আলোচনায় আমারই হয় ত কোনকালে কল্যাণ হইবে। সময়ের সময়ে ব্যাপারের বিশেষ
বিকৃতি ও চরিত্রের চঞ্চলতা দেখিয়া লবণ্য উন্নতির আশা একবারে বিরখন দিতে হয়।

২২
চারিদিকে দেখিতেছি তাহারা পরম পবিত্র নিঃস্বার্থ ধার্মিক বলিয়া। এক সময়ে দেখিতেছিলাম, অস্বীকার পদ্ধতি তাহারা কালক্রমে অন্য প্রকার হইয়াছিল। তাহাদের গত জীবনের তুলনায় আমার এ জীবন কি ছিল! অতি তুচ্ছ ভাবিয়া যে সকল সাধ্য প্রলোভনকে সাধারণ লোকেও অগ্রহ করে, দেখিতেছি মহাত্মাজী পরিভাষা। যাকারিরাই বিষ্ণুর চক্র পড়িল। তাহাতে ঘূর্ণন হইতেছিল। মুতলাং আমার আর তোমার কি? তবৈ কুলী হইল কেন, পতিত হওয়া গুরুনি সহ্য; অথচ পতিত হইলে আমার বস্তু আসা সহ্য নয়। আমি নিক্ষুর জানি, যতদিন আমার সূত্রবদ্ধ সমভূত্ত পবিত্র মুর্তি আমার অন্জনে অগ্রহ খাকিবে, ততদিন আমার পতন নাই; মহাইন্দর বাক্যে অবিষ্কার ও গুরুদেবের কৃপা-বিশ্বাস আমার অপরাপরের হেতু হইবে। নিজেকে বড় মনে করিয়া যখন সকলকেই মুক্তি করিব, তখন আমার আর উত্তর কি প্রকারে হইবে? কিছুকালে এই সব চিন্তায় আমি বড়ই উদ্ধে ঘূর্ণে করিতেছি। কিন্তু এই দুর্গতি ও অবনতি ঘটিলে, হয় তে এই ভাবেই আমার চেতনা সম্পাদন ও সমাজের হেতু হইবে। আমার নিজ জীবনের ধার্মিক ঘটনা। তো আমি আমি কখনও অবিষ্কার করিতে পারিব না। এই বলিতে আনন্দনামের জীবন-পক্ষে আমার দয়া গুরুদেবের বহুদৃষ্টিতে সময়ে সময়ে যে মনোহর পথ প্রশস্ত হইল উঠে, এই ভাবেরই তাহ। এক সময়ে আমার চক্ষুর সমক্ষে আমি। ধরিবে। তুলিবে, গুরুদেবের মূর্তি এই ভাবেই আমার সূত্রায়। তুলিবে, এই শোকার্ভাসায় উপলব্ধ হইল, আমার ভাবের লিখিতে সংকল্প করিলাম। শীঘ্রগুরুদেবের শীঘ্রায় মনকে রাখিল, স্বর্গীয় প্রভুর মহানদের পবিত্র মূর্তি সরণ করিল, এবারে আমার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলে প্রবৃত্ত হইলাম।

সৎসঙ্গলাভ। গোপনাহাত্স্য ও তপ্রাণে আর্থ।

তাগলপুরে আসিলেও আমার রোগের স্থায়ী কমিল না। মনে একটা ধারণ। জমিল, আমি অবধি দিন বাচিব না। সংসারে আসা আমার বৃহৎ হইল; আকাশভূত্ত রত্নান্তনের নাম করিতে পারিলাম না। এই উদ্ধে ও দৃষ্টিয়া আমার বিশারদ অশাস্তি হইতে লাগিল। আমি তখন নিদ্রিত একটা নিয়ম নির্দেশ করিয়া সারাদিন কাটাইতে লাগিলাম।

গুরুদেবের কৃপায় নানাজাতীয় সৎসঙ্গীও আমার সহজেই লাভ হইল। শুনিয়াছিলাম চাকা কলেজের কুলের মাহার শীঘ্র হরিনাথের চৌধুরী মহাশয় গুরুদের নিকটে সংসারের কতকগুলি নিয়ম-পদ্ধতি শিখে করিয়াছিলেন। তীর্থ বৈষ্ণব অবলম্বনপুরুষ সর্বন্তাগী
উদাসীর মত পদক্ষেপ বহুদশ পাশ্চাত্য করিয়া, ক্ষেবকল হয় তিনি এই ভাগলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইযাছেন; পথে পথে তিনি হরিসভার্তনে ভাবেষ্ঠানের তরঙ্গ তুলিয়া অনিরাথপুরের প্রাণী ধনের বোঝা প্রবাহিত করিযাছেন। ভাগলপুরের হরিসভার্তনে হরিসভার্তনে বামিকলীর অন্তর্গত ভাবাশী বদ্ধিয়া সকলেশ বিমুখ হইযাছে। সকলেশ তখন বামিকলীকে ভাগলপুরে কিছু দিন থাকিতে অনুমোদন করিযাছেন। অনৈক প্রসিদ্ধ উক্তি ধৰু আদর যত করিয়া বামিকলীকে নিজ বাড়ীতে লইযাছে আসিযাছেন।

ইংরাজিশিক্ষিত লোকের ভগবানের নামে স্মরণ হয়, সংক্ষে বিলুপ্ত হয়, ভাগলপুরের দিকতলপ্রদায়ের ইহা বড়ই অশ্রু বোধ হইল। তাহার বামিকলীকে খুবই শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিযাছেন। হরিসভার্তনের বিদেশের নাম সহরের সবুজের রাগী হইযাছে পড়িল। এক দিনের অধিককল বামিকলীর কোথাও দাঁড়িযার নিয়ম নাই; তাহার উপরে গোত্রদরের এটি বিশেষ আদেশ। কিন্তু হরিসভার্তনের লোকে মর্য হইযাছে বামিকলী ঐ আদেশ লজ্জা করিযাছে। ফেলিযাছেন। “আমি সপ্তাহ, আমার আকার বিধিলিখিত কি?” এইরূপ ধারণায় বামিকলী অত্যন্ত উচ্ছায়া দিযাঁ উক্তি বারুব বাড়ীতে আসন করিযাছেন। এক দিকে প্রত্যেক হরিসভার্তনে ভাবাশীর উচ্ছায়া যেমনই তিনি সকলেকে গোপন করিতে লাগিযাছেন, অপর দিকে তেমনই কুসংগরেণ পড়িযার, মাংস ও উচিতাদিয়ের সংবরে গোত্রদর লজ্জা করিযাছে, ভিতরে ভিতরে দিন দিন মনিযাঁ হইযাঁ বাড়ীতে লাগিযাছে।

অতঃপর এক দিন বামিকলী অন্ধকার অবহ্ষাবে হইযাঁ আমার লিখিতে আসিযাছেন—
“ভাই, আমার রঙ্গ কর। আমার সর্পনাশ হইযাঁছে। সর্পনাশীর সঙ্গে সঙ্গে গোত্রদর আমাকে যে অবহ্ষু কুঁ করিযাছেন, তাহা আমার চূড়া গিযাছে। হযাঁ, হযাঁ! আমি একটি নতুন রাগে প্রবেশ করিযাছিলাম, নিয়া আমার নিকটে নতুন নতুন লুখ প্রকাশিত হইত। দর্শনের দিকে আমার এই পরিদর্শন হইযাছিল যে, সারা দিনে আধ ঘণ্টা সমর্থ দর্শনের একটা কিছু না পাইলে অশ্রুর হইতাম। সক্ষীর্ণনে ঐ দর্শন আরও পরিসীমা হইত; সুতরাং কোথায় সক্ষীর্ণন? কোথায় সক্ষীর্ণন? বলিযাঁ। ঘরিযাঁ বেস্বায়িতে লাগিযাছে। গোত্রদর বলিযাছিল—‘নিযাই নাম করিও, এই নামেই সব হবে।’ কিছু ইটনাম আপনাকেও আমার সক্ষীর্ণনের বেশী বেশী হইল। ঐ সক্ষীর্ণনের লোকেই গোত্রবাক্য ও সর্পনাশের নিয়ম অগ্রাহ করিযাঁ উক্তি বারুব বাড়ীতে আসন করিযাছে। কার্য্যে নিয়া নতুন দর্শন হইতে ঐ লোকে গোত্রদরের একটি একটি আদেশ লজ্জনেই আমি বিপর্য্যায় হইযাছি। একটি আদেশ লজ্জনেই সঙ্গে সঙ্গে দশটি নিয়ন্ত্র স্থিতিযাঁ আসিযাছে পড়িল।
পরে, অনাচারে ব্যক্তির সবই ক্রমে হারাইয়াছিল। কিছু দিন ঘটে না ঘটতে আমার সঙ্গীর সত্ত্বার এ ভাব ভক্তিতে শুভীয়ার গেল। এখন কী করে? যাওয়া বন্ধ করিয়াছি; আমার সে ভাব নাই, আমার প্রতি এখন আমার কাছারও শ্রদ্ধা নাই, বরং সাধারণের অবস্থাই জমিয়েছে। আমি এখন উকিল বাবুর ছেলেদের গৃহশিক্ষক হইয়া দিন কাটাইতেছি। আমার উপায় কর।"

স্বামীজী পঠানার ঢাকা কলেজে মধুর বাবুর খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন। মধুর বাবুকে স্বামীজী অক্ষরে স্নেহ হরবন্ধন কথা বলায়, তিনি দুঃখ করিয়া, স্বামীজীকে আমাদের সঙ্গে রাখিবার জন্য নির্দেশ ছেলেদের মাতার নিযুক্তি করিলেন। বেতন মাসিক ২৫২ টাকা; আহারাদির ব্যয়। আমাদেরই সঙ্গে হইল। সকালে সদ্যকায় ৩ ঘণ্টা করিয়া ছেলেদের পড়াইয়া, অক্ষর সময় স্বামীজী নিয়মিত সুধারণ সাধন তথ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। আমার মাসিকে স্বামীজীর বেতনের টাকা কয়টি পোষার তীক্ষে পাঠাইতে লাগিলাম। নিয়মে চলিয়া কঠোর সাধন তত্ত্বে কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীজী স্নেহ হরবন্ধ শোধনার লাগিলেন। এখন স্বামীজীর সঙ্গে বড়ই আনন্দ পাই।

মধুর বাবুর কেরালী হিন্দু মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয়ের বরফ হ্যাঁ তাহার প্রকৃতিতে বস্ত্রবর্তী সাধ্য। আফিসের কর্তব্য ধখার্দী তা শপথ করিয়া, তিনি অবশিষ্ট সময় গুরু দর্শনান্তরে অভিবত্তিক করেন। উিসন্তিক্ষার মহাবিদ্যালয়ের নিয়মিত এবং গন্তব্য, ব্যাপ্ত ষট হইলে মহাবিদ্যা বাবুর অভ্যস্ত। রাধাকৃষ্ণ বলিতে তথ্যের চক্ষে বল আসে। প্রথম এই রাধাকৃষ্ণ দীপ বিশ্বস্ত্রে যাত্রি স্নাতের িষিদ রচনা করেন। আফিসের কাজ করিতে করিতে অতীতক ভাবনাভােঙ্গে কখনও কখনও অবস্থা হইয়া পড়েন; তখন আফিসের কাজ বন্ধ থাকে। এই মহাবিদ্যা বাবু আমার সঙ্গে এক ঘরেই থাকেন। স্নাতক ভাগলপুরে আসিয়া, ভাগলপুরের বাপামাতা, আমার সৎসাহিত্য অভাব ছিল না।

আমাদের বাসার পূর্বপুর দিকে স্রষ্টিত্ব গঙ্গা—আজ কাল চড়া পড়াতে কিছুই অপ্রের সরিয়া পিছছেন। গঙ্গা তিব উপরেই পরিণাম হইয়াছিল, বিশ্ব বায় সত্ত্ব সত্ত্বো করিতেছি, কিন্তু গঙ্গার মান করিনা। বন্ধ জল ঘৃত স্নাতক অধিকির্ণ হইলে—এই যুক্তি ধরিয়া আমি কৃপোমন মান করি। এই স্নাতক হিন্দু ও মহাবিদ্যা বাবু আমাকে পুণ্যতাপ। জাহাজের কত মহাত্মা বলেন! আমি তাহি কুসংসার বিশ্বাস। উভাইয়া দেই। যাহা হউক, উহাদের আন্তরিক আগ্রহে ও অদূরোধ চেলিয়া ফেলিতে না চাই।, একসঙ্গে সকলে আমদের, সাধের
মায়া। ]

প্রথম খণ্ড। ১৬৫

বিশেষে, গ্রামান্ত আরম্ভ করিয়া। কয়েক দিন গ্রামান্ত করিয়াই শব্দের বেশ হালকা, জন্ম বা বাগের বোধ হইলে লাগিল; দেখিলাম আগুনে গ্রামান্তে শব্দের সমভ প্রাণি ও অবসাদ দূর করে এবং মনটিকেও মনে গিয়া করিয়া দেয়; প্রাণাইমন্ত ও পবিত্রতা মানের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে অন্ত আলোচিত গড়ে; ভগবানের নাম সরস্বতে আপনা আপনি চালিতে থাকে। একক পরিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে লাগিল। এক দিন গ্রামান্ত করিতে করিতে অক্ষম্ব আমার জীবিত ও বংশগত সংগ্রাম আলিয়া আমাকে অভিজ্ঞ করিয়া ফেলিল। মনে হইল, এই গগার জল স্পর্শ করিয়া আমার পিতা পিতামহ প্রভূত পুরূর্ব পূর্বতন 'উদ্ধার হইল' মনে করিয়া কত আনন্দই করিয়াছেন! পুরাকালে পৌরী ধারণার এই গগারে ভগবানের কতই আরাধনা উপস্থিত করিয়াছেন! না জানি কি ছু প্রভাব করিয়া স্মারণ। ইহাকে প্রতিদিন মোক্ষদাতিনী বিষ্ণুর শুizador করিয়া গিয়াছেন। পরলোকে থাকিয়া, এই গগারে পাইলে, এখনও তাহাদের কত আনন্দ হইবে? আমি উহাদের উদেশে আজ অজলি বীর্য গগারে দেই। ইহা ভাবিতেই আমার কারা আলিয়া পড়িল। মনে হইল যেন কত যোগী আর্থ, দেব দেবী এবং আমার পূর্বপুরুষগণ আমাকে অন্য অকাশে থাকিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন। আমি হঘাটে জল তুলিয়া তাইহাদের মরণ করিয়া উদ্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ইহাতে আমার বড়ই আনন্দ হইল। দেব দেবী, খাইব মূলি ও পিতৃপুরুষের আজ আমার কার্যে সঙ্কট হইয়াছেন—এই প্রকার কল্পনায় সারাদিন আমার উৎসাহ আনন্দে কাটিয়া গেল। করলা হইলেও এই আনন্দের লোভ আমি চাহিয়া পরিলম না। প্রতাপ গগারের সময় উহাদের উদেশে জল দিতে লাগিল। পরে আর এক দিন মনে হইল—জলই যখন দিতেছি তখন নির্দিত প্রাণিত ধরিয়াই দেই না কেন? শাস্ত্রেতে প্রাণামুর্তির উহাদের নাম ধরিয়া জল দিলেই তো উহাদের আধিক তৃপ্তি ও আনন্দ হইবে। এই ভাবিয়া, আমি নিতান্তের তর্পণপ্রণালী করিয়া করিয়া। সেই সময়হইতে আমি প্রতাপ প্রণালীতম নিয়মিত তর্পণ করিয়া আসিতেছি।

তদ্রবেশে চক্রশক্তির অনন্তভুতি।

রাত্রে আহরান্তে আজ রামাজীর সহিত একা এক বিচারযুক্ত শয্য করিয়া ওজনদেবের সাহায মাধ, প্রসঙ্গে তন্ত্রবেশ হইল। দেখিলাম—বামীরা পদাস্বীহেরা। আমার ১২৩৬। অধোদেশ টিয়া দিয়া বলিলেন—"এই দান নুলাদার; প্রাণান্তদার। এখানহইতে শক্তি আকারণ করিয়া উদ্দিকে সহায়ে লইয়া যাইল; সমাধি হইবে।"
শ্রীশীলদ্বুদ্রসঙ্গ। ১৬৬

আমি তাহার কথামত ২৪ বর্ষ প্রাগায়ামে দম দিয়ে মূলাদার চক্র দিচ্ছি। উত্তরের দিকে সক্রিচিত হইয়া উঠিল। অনন্য ঐ চক্রহইতে একটা শক্তি মূলদুদের তত্ত্বে দিয়া সর সর করিয়া উর্ধ্বদিকে চলিল। সে শক্তির হস্তমন্দির গতির সঙ্গে সঙ্গে আমার পিছী, ধনমী থেকে ছড়িয়া যাইতে লাগিল। ভয়ানক একটা যন্ত্র অনুরম্ভ করিয়ে লাগিল। এসময়ে প্রাগায়াম ধারায় কেন্দ্র করিল, কিন্তু পালিল না। একটা অস্মিত শক্তি আমাকে অবশোচ করিয়া মূহূর্তে প্রাণায়ামের দম চালায় লাগিল। দমে দমে শক্তি উদগামী হইয়া উপর উপর করেকটা চক্রের আবরণ ছড়িয়া যাইল। দমে হইল যেন নাড়ি-নৃদ্রী সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরের যা কিছু সমস্তই ছড়িয়া হইয়া গেল। ‘উহ উহ’ ছাড়ি। আমার তখন আর কোন বাক্যাদি নয় শক্তি বহিল না। যাতনায় অস্মিত হইলা আমি ক্রমে মৃদুচিত-প্রয়া হইল। একটু পরেই এই শক্তি, পথ না পাইলা, পক্ষ বুঝিয়া হঠাৎ নীচে আসিয়া পড়িল। এসময়ে কুষ্টী আমার বাধা হইল, কিছু এ আবশ্যক মুখশাক্তিত্ব অত্যন্ত করিল। পরক্ষণেই আমার সেই শক্তি আরও যেন অধিকতর প্রবলবেগ সর সর করিয়া উদরদিকে ছুটিল। পুনঃপুনঃ, কিছুকাল ধরিয়া, এইভাবে শক্তির অংশ উচ্ছ গতাগতিতে আসি একবারে অবসর হইয়া পড়িল। অক্ষমাং একবার মহাবেগে উথিত হইলাঁ, এই শক্তি অত্যন্ত গির সহসা সম্পূর্ণ বিপরিৎ লাইল করিল। তখন পরমাণু সাগরে আমি যেন একবার চূরিয়া গেলাম। ইহা পর আমি কিছুই বলিবার নাই। কতক্ষণ যে এ অবস্থা ছাড়ি হইল জানি না। পরে, আমার এই শক্তি মূলাদার নামিয়া আগারাত্রি আমার জ্ঞান হইল। সমস্ত শরীরের দর্শন ও অবসর হইয়া পড়িয়াছে, দেখিলাম। অতিসংক্ষেপে প্রত্যক্ষ আলোচনার ক্রমটি মাত্র সঙ্গে লিখিয়া রাখিলাম। এই সময়ে হঠাৎ শ্রীমান কারিগী উঠিলেন এবং বলিলেন—‘ভাই, এ কি অপ দেখিলাম? শুরু তেন তোমার ভিতরে কি ‘একটা অপরিষ্ঠ’ করিতেছেন। কিছুকাল চেঁচার পর, আঞ্জেশ করিয়া, হাতের ঘণ্টা নান্দিয়া তিনি বলিলেন—‘আহা হা! সবটা হ’ল না, একটু রয়ে গেল।’

অপূর্ব সূর্যুমগল দর্শন।

এখন প্রায় আমি রাতে তিন সময়ে উঠিয়া গোরীচ কার্য সমাপনান্তে, ৩টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত নাম প্রাগায়াম ও কুষ্ঠিত করিয়া। ঝাঁকের পর শ্রীমানী ও বিকু বারু সহিত জলদেবী ও চা-পানি করিয়া ৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত নিজন বাগানে বসিয়া ‘তারকা'
লাভ করিয়া থাকি। আহারের পর বাসাহিতে কিছুই ব্যবধানে, গল্পগৃহের জন্মানবস্ত্ত শিবলিঙ্গের গির্গির অত্যন্ত বেলা ১২ টা হইতে ৫ টা পর্যন্ত নির্জন সাধনে কাটাই। বিকাল বেলায় আমাদের বাসায় বব ভেড়েলকের সমাগম হয়। সকালাব্দিন মহাবিশ্ব বাঙ্গলোর ও রামীরী তাহাদের সাহিত্য লেখনীতা ও সমাজকর্ম করেন। রাতে আহারাদিত্য নির্ধিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ধর্মজীবনের বিরাম হয় না। মধ্যে মধ্যে আমরা রাতির বাগানে থালালুবায় যাইয়া বসি। গভীর রাতিতে জঙ্গলের ভিতরে সন্ধ্ব থেকে ধুনি রাধিয়া নাম করিতে করিতে বড়ই আরাম পাই। সায়া দিনরাতেই আমাদের যেন একটা ধর্মোৎসব চলিয়া থাকে।

পূর্বের স্থানটনার পরহিতে সাধন ভক্তে উৎসাহ আমার আরও বৃদ্ধি পাই। নাম করার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষরিতভাবে ঘোড়েদের রূপ মনে আসিায়া পড়িতে লাগিল। ঘোড়েদের বলিয়াছিলেন—'কল্পনা কখনও করবে না। নাম করতে করতে সত্যবোধ আপনি আপনি প্রকাশিত হবে।' আমি কল্পনা কখনও করি না; আশা একটুকু স্বীয় হইয়া নাম করিয়াছি আমি অনন্তসারে ঘোড়েদের রূপটি আপনি করয়ে আসিয়া পড়ে। তখন উহাতে এতই আনন্দ পাই যে, কল্পনা হইলেও উহা আর তাগ করিবার যে থাকে না।

ইতিমধ্যে এক দিন ভোবেলা গঞ্জালাই করিয়া, নাম করিতে করিতে শামীজী সঙ্গে বাসায় আসিতেছিল, মনে ঘোড়েদের মনেহরে রূপের আর্কিটেকচারে—অকষ্ঠ লাগারের নূতন আকাশে অসংখ্য যৌনতাকে সত্য-জ্যোতি-সমবিতি অপূর্ব সৃষ্টির সঙ্কৃতি করিয়া উদিত হইল। কোয়েক সেকেন্দ্র উত্তর দিকে দৃষ্টি করিয়াছি আমি 'জয় গুরু, জয় গুরু' বলিয়া বলিতে অবশ্যই হইয়া বালিকর উপরে পড়িয়া গেলাম। * * * সাধন রাজ্যে কত ফি আছে, জানি না। এসব দেখিয়া অবাক হইতেছি।

সাধনে অক্ষমতাহত কৌশলবুদ্ধি।

গঞ্জালাইর গুণে অথবা দর্শনের লোভে সাধনে উৎসাহ আমার বৃদ্ধি পাই। অতি খাস-খাসে অবিশ্বাস্ত নাম কর। ঘোড়েদের আদেশ; কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও দেখিতেছি তাহা আমি পারিতেছি না। প্রত্যহ নিকরহিতে উঠিয়া, খাস-খাসে নাম করিব বলিয়া চুক্তিতে সহিত নাগরিকা বাই; কিন্তু একটুকু সময় উহাতে লক্ষ্য স্থির হইতে না হইতেই দেখি অজ্ঞাতসারে মন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পুনঃপুঃ এই একার চোখে হয়রান হইয়া পড়িতেছি। খাস-খাস ধরিয়া নাম করা কিছুতেই অভ্যস করিতে পারিতেছি না। বহু
চেষ্টা করিয়াও যখন উচ্ছ পারিলাম না, তখন আমি এক কৌশল অবলম্বনপূর্বক গুরুদের আদেশ প্রতিপালন করিব, স্বার্থ করিলাম। দিনে রাত্রে বসন্তক্ষণ খাস প্রখ্যাত হইয়া থাকে ততসংখ্যক নাম করিব সকল করিলাম। পরে গুরুদের কৃপা করিয়া প্রতিটি খাস-প্রখ্যাতের মাথায় উচ্ছ বলিয়া নিলেই আমার প্রতি খাস-প্রখ্যাত নাম করা হইবে। এইরূপ বুদ্ধি করিয়া ২১৩০০ শত নাম করিতে লাগিলাম। যদি খাস প্রখ্যাতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় নামের সংখ্যারও বৃদ্ধি করিয়া প্রায় ৩০০৩২ হাজার নাম করিতে লাগিলাম। কর ৩ মালায় নাম জন এত অভ্যস্ত হইয়াছে যে, নিজের অবস্থায়ও আপনি আপনিই আমার কর ঘুরিয়া আসে, অপরের মুখে শুনিতে পাই। সংখ্যা পুরুষ করিতে গিয়া সারাদিনে কাহারও সঙ্গে এখন আর কথা বলিবারও অবসর পাই না। বাহিরে খুব স্বচ্ছ থাকিলেও, সংখ্যাপুরুষচৌঁদীর ভিতরে অতিশয় চকল হইয়া পড়ি। অনেক সময় এই অজ মাথা গরম হইয়া যায়। গুরুদের বলিয়াছিলেন—“আমাদের সাধনে খাস প্রখ্যাতসহ নামের জোমোলা।” যখন কিছুতেই যাহা আমি ধরিতে পারিলাম না, তখন স্বর্বিধা বুঝিয়া বাহিরের মালা এতো না করিয়া আর কি করিব? আমি না, গুরুদের আমার এই কৌশলপূর্বক সাধারণগণলীলামত সাধনে অনুমোদন করিয়া দিবনি কি না।

ত্রাভক সাধনে দর্শনের ক্ষেত্রে।

ত্রাভক সাধনে অনেক কাল করিয়া আসিতেছি। গতবংসরহইতে এই সাধনের সময় নানাপ্রকার দর্শন আসন্ত হইয়াছে। এ পর্যন্ত যত একার যাহা দর্শন হইয়াছে কোন আসনের তাহা ত্রাভক আমার দেখিয়া হইবে।

(১) সাধনসময়ে লক্ষ্যস্থলে ৪১৫ ইঞ্চি পরিমিত, বড়ো সিংহ মস্ত, বহস্তুবিশিষ্ট গোলাকার, অতিশয় চকল, নিবিড় রূপবর্ণ ৪১৫টি চক্র অবিচ্ছেদ পরিতে নামান্ত্রে এবং তাহাই আমার মূর্ত্তিকাল মধ্যে দক্ষিণাবর্তে অভ্যন্ত রূপবর্ণে পূর্ণায়মান হইতেছে। কিছুদিন দর্শন করিলাম।

(২) দৃষ্টি স্বরূপ করিতে করিতে পরে দেখিলাম উচ্ছ চক্রগুলির আয়তন কমিয়া গেল। পরে, উহারা পরস্পর সংগ্রহ হইয়া একটিমাত্র দৃষ্টি মণ্ডলাকারে পরিণত হইল, এবং ঐ মণ্ডল মধ্যে সরিয়া মত মূল মূল অসংখ্য জ্যোতিষিকিরণ প্রকাশিত হইল। উহার চতুৰ্ব্বিংশতে ৪টি উচ্ছ হীরকগুলিবৎ খণ্ডস্তু স্থির করিতে লাগিল। মণ্ডলের মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত বৃহৎকার অতুলনী জ্যোতির্বিরা অবিরাম জ্যোতির্বিরা পুর্ণমান করিতে লাগিল। প্রায় ৩৫ মাস কাল সাধনসময়ে এইরূপ দর্শন হইতে লাগিল।
(3) মায় মাসের প্রথম হইতেই ঐ দশমিতি অন্তাপ্তার হইয়া পড়িল। গাছ কঠিন ও লিঙ্গ পরিবিত একটি মূলের মধ্যস্থলে একটি খেলোকসার, সৌন্দর্য বলয় প্রকাশ পাইল। অথবা একটি দ্বারে পদ্ধতি ও জীবন সমাধি অন্তর্ভুক্ত মূলের সমাধির ভায়ে সমান অর্থে খাটিয়া উঠাকে নেতৃন করিয়া রহিতাঙ্গ। প্রথম ৩ মাস কাল এইরূপ দর্শন করিলাম।

(4) উহাতে দৃষ্টি হির রাখিলে রাখিলে বলম্বনে উহা অত্য আকার ধারন করিয়াছে। চক্ষু করেক সেঞ্চের জন্য একটি হিত ও পলককষ্ণ হইলেই ৫৪ ইঞ্জি পরিষ্ট, জ্যোতির্ময় খেলোকসার সমতাশুষ্ঠ হয়, সুতাকার মূলের মধ্যে দৃষ্টি হয়। কিছুক্ষণ উহাতে তীর দৃষ্টি রাখিলেই উহা একটি স্থানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অধিকতর ঘন ও উজ্জল রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। যে স্থানে সেখানে, যে কোন অবস্থায় দিনে ও রাত্রে যখন তখন এই জ্যোতি একটি দৃষ্টি হিত রাকিবারাহি দর্শন হইলেই।

তারক সাধনের প্রথম করে কিতিভেদে একাশ্ব দৃষ্টি হিত করিয়া আহিতে ছিল। উত্তরদেশের ব্যাপারে সেই সঙ্গে এখন যোগে দৃষ্টি রাখিলে আবশ্য করিলাম।

তরপণে ছায়ারূপপদর্শন। কুকুরের কাণ।

অতি প্রভাষে যখন গঙ্গাবনে বাড়ি, পথে প্রতাহই আমার মনে হয় যেন দেবগণ, ঈশ্বর পরমেশ্বর, ও পিতৃপুরুষগণ আমার হাতে গঙ্গাজল পাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বাইতেছেন।

{2035} শাসন করিয়া উর্দ্ধমুখে রক্ষারু তাহদের অংগোনী আমারেই করার পায়। পিতৃপুরুষ কলে প্রতিগৃহ জল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জলের উপরে অনুষ্ঠিত পরিমাণ অপেক্ষ সময়কাটির চঞ্চল ছায়া দর্শন করি। দেবতর্পণ ও পূজিতর্পণ কলে এইরূপ ছায়া করলা করিয়া দৃষ্টিতে আনিতে পারি না। পিতৃপুরুষ শেষ হইয়া গেলে, মূহুর্তকল উহা আর থাকে না।

আজ দেবতর্পণ ও পূজিতর্পণ শেষ করিয়া পিতৃতর্পণ করিতেছি, ৭৮ হাত অন্তাবর গঙ্গার পাড়ে একটি একাঙ্কুকুর সত্তিতে আমার দিকে তাকাইয়া রহিতাঙ্গ দেখিলাম। ভবন্দরে শীতে অন্তর্ভুক্ত কুকুর জলে নামিয়া ধীরে ধীরে আমার দিকে আসিতে লাগিল। স্বাভূক ও মহাপিতৃ বারু উহাকে তাকাইতে চেষ্টা করিলেন; কুকুরটি তখন কীভাবে অভি কাতরতমে এমন একটি খেলসখ্য শব্দ করিল যে, তাহ শুনিয়া উঠার তাহাকে রাখা বিধিতে না। তবে মায়ের ভেজের নীতে গঙ্গার পরিধানে মানুষ অবশ হইয়া গড়ে, আর ২২
ভাগলপুরের সাধু পার্কোর্টী বাবু। ইউরোপের স্বাতন্ত্র্য রাখাই সাধন ও 
সাধারণের উদ্দেশ্য।

ভাগলপুরের বারোজাভাতে শীতোষ্ণ পার্কোর্টীর মূলোপাধ্যায় নামে একজন সাধারণলাইক, নিষ্ঠাবানু ব্যক্তি আছেন; সহায়, হিতি, মূল্যবান, শ্রীপুরী সকল শ্রেষ্ঠাদের লোকেই তাদেরকে পরম ধার্মিক মহাযুগ। বলিয়া প্রথম আন্দোলন করে। ভারীচিত ও মহাবিভূতি বাবুর সহিত তাহাতে দৃষ্টি করিতে পারে। পুরাকালে পণ্ডিতের তরুণদের নেশাটে রবার শুনিয়াচি, 
পার্কোর্টী বাবুর আশ্রমটি যেন তাহাই দেখিলাম। নিতন্ত্র বাগানটি নানা প্রকার ফলকলে 
সৃষ্টি হইয়া বিভিন্নপ্রকার রূপে পরিণত। উপস্থিত হওয়ায়ই ইচ্ছা হইল 
উচ্চে যে কোন স্থানে বসিয়া ভগ্নানীর নাম করি। রক্তলোক সহিত সমস্ত আশ্রমট 
যেন ভবনভাবে পরিপূর্ণ বহিয়াছে। অন্ততঃ এমন স্থানে তপস্ন কোনও দেখি নাই। 
পার্কোর্টী বাবুর অনন্তকালের বিশ্বত বাগানের এক প্রাচু। পার্কোর্টী বাবুকে দেখিয়া মনে 
হইল যে একটি ধর্মের দৃষ্টি করিলাম। রক্তগত উপদেশ প্রশ্নগুলোর পরিবর্ধিত 
এবং পরিবর্ধিত যে মাথা বহিয়াছে। তিনি বারং বিশেষ অনুভূতি গাঢ়গাঢ় ও সহায় 
পরামর্শ দেওয়ার আশ্রে প্রবেশ করেন, পরে শালগাম ও পঞ্চদশাবার পূজা। দোষী। চৌদী, 
গীত, উপনিষদের ধর্মশাস্ত্র পাঠ পূর্বক হোন করিলে খানেন; ২২ টার সময়ে আগন 
হইতে উঠিয়া শুভাকার বিষয় প্রচ্ছন করেন; অতঃপর এক ঘটা কাল বিশ্বাসে কুটীরের 
মেজে বসতে; এবং ভগবদ্ধাবে অভিযুক্ত হইয়া সারাদিন ধান ধারণার অতিবাহিত 
করেন। রাত্রিতেও অতি অসময় নিজেই বাইরে, অবশিষ্ট নিশা ইউরোপে কাটাইয়া দেন। 
আজ ৪২ বৎসর কাল তিনি এই নিয়মে আছেন; শুনিলাম, একটি দিনের অন্যান্য
নিয়ন্ত্রিত কার্যে তাহার বাধা হয় নাই। যেহেতু ইহার অগ্রাধা পতিত; পুরাণ উপনিষৎ অনুসারে শাস্ত্রের ইহার অদীন বিশ্বাস; আর পার্বণ কোপাণমিত্র ইহা প্রদায় সন্ত পাঠ করিয়া থাকেন। এতেকার শুরুত্তর সন্তাহার 'ধৰ্ম্মোদিত' বলেন।
'ধৰ্ম্মোদিত' সম্পাদ-পৰামাদ ইহার আসনের ধারে জুপীকৃত রহিয়াছে দেখিলাম।
আপন ভজনধার নিরুত্ত ও নিঠানর থাকিয়া সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থীদিগকে কিরূপে এমন অন্ধতাত্ত্বিক করেন, ইহা যেই অশক্তি বোধ হইল। পার্বতী বাপু ভক্ত কি স্বামী, রুঞ্জিত না। ভক্তির কথা বলিয়া বলিয়াই তিনি কাহিনী আকৃত হন। আবার আমার আলোচিত সময় স্বয় বুঝি হইয়া বলেন। সরল প্রাণ, বিনয়ের সহিত জাতিকের বঞ্চনায় কর ভজন করিয়া সম্প্রদায় করেন।
পার্বতী বাবুর সঙ্গে আমার বড়ই ভাল লাগিল।
প্রতি সম্প্রদায়ের আমি যেই দিন কাহিনী তাহার সঙ্গ করিয়া লাগিলাম। পার্বতী বাবুরও আলোচন সেই আমার উপরে পড়িল। তিনি আমাকে উপনিষদের মন্ত্র বুঝিতে ইচ্ছা করিয়া আতি সংক্ষেপে সাধ্য পাত্রপূর্ণ প্রভূতির মত, উপদেশ করিয়া লাগিলেন।

ধীরগীতকে দৃষ্টির আলোচনায় আমার তাহার বঙ্গ-সমাচারে নিষ্ঠুর বৃত্তি পাইল। তাহারই ফলে, আতিপথ প্রত্যেক ব্যাপারে আমি বিচার করিয়া চলিতে লাগিলাম। শুনান থাকিয়া নিয়মনিষ্ঠা পুরস্কার আগস্থোধ্যকের সাধন ভজন করার ফল সেখানের কৃপায় অশক্তির উপরেই প্রত্যক্ষ করিয়েছিলাম; কিন্তু কিছুকাল পরে এই দর্শন শাস্ত্রের বাণী, সমস্ত ও জটিলতাদিক বিচার বিষয়ে আমার অন্তর বীরে বীরে শিক্ষা ও সংশোধন হইয়া উঠিল।
গুরুদেবের আদর্শ কৃপার উপরেও আমার বিচার অসিতে লাগিল। তখন তাহার প্রতি অপরাধ সাক্ষরোগ্যে চুম্বক উঠেছে মহাপ্ররাধার আহরন।
নিজের প্ররাপরে এসব অবহার আত্মা লিখিয়া রাখিতেছি। তা চায় খান। পুরাণ পাঠ করিয়া ও দর্শন শাস্ত্রের একটি অংশ আলোচনা শহিয়া, 'সাধন করার প্রয়োজন কি ?' এই সনেঙ্গ কমিন।
'পুরুষকারের অশ্বিনী পার্বণ কোপাণমিত্র লইয়াই এই সমস্ত সংসার চিহ্নিত হইয়া উঠিল।
কিন্তু পুরুষকারের স্বাধীনতা তদ্ভাবে অশক্তির উদয় অবশ্বক্ত হয়, তাহা হইলে উদ্যান ফলাফল যে বড়ই অনিশ্চিত হইয়া পড়ে।' কারণ অনন্তচনে হরশৌখ, সদৃশচন নিয়ত হইলে, প্রার্থক ভেগ নিষ্পত্তি বা স্বভাবিত হইতে পারে না।
আবার এই প্রারম্ভ যদি কার্যকের প্রুতি বা তদস্বার্থের হেতু হয় তাহা হইলে পুরুষকার তো সম্পন্ন অত্যন্ত কথা হইয়া পড়ে। আবার পুরুষকার দখল ভোগের সৃষ্টি হয় একথা বীরের না করিলে ভোগের বা আসিল কোপাণতে ; আর যদি প্রারম্ভে বীরের বাণ্য ও ভোগনির্দেশার
হেতু হয়, তাহার হইলে সেই প্রাচীনের অর্থ মূলতঃ ভগবদ্ধীত্রীতি আর কি বলিব? তাহারই ইচ্ছার প্রাচীনের কষ্ট হইয়াছে এবং কার্য ও ভোগ হইতেছে। জীবের প্রাচীনতাতে একটা ব্যতীত বা ভালীনহ ইচ্ছা আর নাই। হুতরাং মনে হয় সমস্তই ভগবদ্ধীত্রী হইতেছে; জীব শুধু ধার্মিক ও ঝোঁকা মাত্র। তাহা হইলে সাধন ভজন আর করি কেন? নিয়ম নিঠায় এবং সদাচারে ধার্মিক এত অশাস্তি উঠেগেই বা ভোগ করিতে কেন? গুরুদেব নিজেই বলিরছিলেন যে আমার আর কেন সাধনতাতে নাই, আমি তাহার গর্ভ সন্তান, শুধু তাহা। হইলে যাহা আমার ভিতরে সঞ্চিত হইতেছে তাহাই আমি ভোগ করিতেছি। গর্ভস্থ সন্তানের দেহপুষ্টি ও জীবনাধারণ কিছুই তাহার বীষ চেষ্টা নাহে; উহা সাধারণ ভাবে গর্ভধারিণীর মাত্রা ও সম্পূর্ণতায় ভগবদ্ধীত্রীর উপরে নির্ভর করে। সন্তানের অক্ষকলায় গর্ভধারিণীর ক্রেষ হয়, ইহা প্রযুক্ত সত্য; নিয়ম, সদাচার সাধন ভজন এবং গুরুদেবের অনন্তনবার। দেহ মন স্থির থাকে; হুতরাং গর্ভধারিণী তাহাতে শান্তিতে থাকেন; আর মনে মতম চলিত, যাছ। ইহা তাহাই করিলে দেহ ও মনের চঞ্চলতার সঙ্গে সঙ্গে গর্ভধারিণীর যন্ত্রণা ভোগ হইয়া থাকে। হুতরাং দেখিতেছি নিয়ম, সদাচার থাকার এবং সাধন ভজন করার আর কোন প্রভোকত নাই; শুধু নিজে স্থির থাকিয়া আধার স্রষ্টা জননীকে স্রষ্টা রাখাই এই সকলের উদ্দেশ্য। অনিয়মে বঁচিয়া নিয়মে, উচ্চ অল ভাবে হাত পা নাড়াঁ। চাড়া। করিলে জননীর বিষম যন্ত্রণা হইবে, এই ভাব অন্তরে আসিয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকারের সংগ্রাম বদমূল হইলে যে আমার প্রতি কার্য; প্রতি পদক্ষেপ গুরুদেবের অনুত্তর করিতেছেন। যতই নিয়মে ও সদাচারে ধার্মিক এবং সাধন ভজন করিত ততই তিনি শুষ্ক থাকিতেন ও অনন্দ পাইতেন। নিজের উপতির জন্য সাধন ভজন নয়; গর্ভধারিণী জননীকে আরামে রাখাই নিয়ম নিঠাই ও সাধন ভজনের উদ্দেশ্য।

কথায়ই ধর্ম।

আমার গুরুদেবের অক্ষত রূপতে যেসকল বলনাতীত ভাব আমার ভিতরে সঞ্চিত হয় সাধনের ওষ্ঠ রূপতে আমাকে তাহাতে নিয়ুক্ত করিতেছে, আমার ভাব হইতে ফাঁসিয়া সুন্ধর নিয়মে সেইভাবের অনুগমী করিয়া বিচারবাদ। তাহ। প্রতিপল করিতে চেষ্টা করিলাম, জনের অক্ষত না বলিতে অস্থিতে বেশের নিরুপণ বা সীমাসার অর্থে যদি মূর্ত্তি বা বাচালতা বই আর কিছুই নয়, তথাপি
প্রথম খণ্ড।

যে সকল এলো মেলো জননা করাতে, আমি আমার গুরুদেবের ইচ্ছাত চলিতে দিয়া-পূর্ণ হইতেছি, সেই সকলের সহিত এই জীবনের বিশেষ সমষ্ট হেতু এই হলে তাহার অতি সংক্ষেপ লিখিয়া রাখিতেছি; এখন আমার মনে হইতেছে—কর্মই সার। কর্মই ধৰ্ম্ম; কর্ম না করিলে কিছুই হইবে না। কর্মখানার জীবের বাসনা পুর্ণতাত্ত্বিক হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতেই পরিণামে জীবের ব্যবহার অবস্থা লাভে মুক্তি হয়। এখন কেনু প্রকার কর্মভাগ্য কাহার বাসনা ক্ষয় হইবে তাহ। কি প্রকারে জানা যাইবে? কর্মেতে বন্ধন হয়, শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশও তে দেখিয়াছি। শাস্ত্রবাক্য যখন অভ্যস্ত, তখন তাহার সঙ্গে আমার এই সিদ্ধান্তের সামর্থ্য কোথায়?

বাসনামূল্যের কর্মের ফলভোগেই যখন জীবের পুর্ণ তুষ্টির শরণাপ্রাপ্তি, তখন সেই বাসনামূল্য কর্মই তাহার পক্ষে কলামকর বা রসম্পন্ন। জীব বাসনামূল্য কর্মের নিমিত্ত কেহ সন্ধ্যের আশ্রয়ে সাধুকুমার। ভোগের পরিসংখ্যানে শরণাপ্রাপ্ত লাভ করিতেছে, আর কেহ বা ভিন্নমুখ ভোগের কল্পনায় তদনুরূপ রক্ষণের সহায়তায় ভোগের তৃষ্ণাসাদানে মূল অবস্থা উপনীত হইতেছে। কোনো জীব যে কি ভাবে কোনো কর্মদায়। আপন বাসনামূল্যকর্ম যতক্ষণ মূল্য ক্ষয় হইবে তাহার কেননা হইতে হইতে। সাধু কর্মদায়।

যখন স্বরূপাধিকের কল্পনাণু হইতেছে; অসাধু বা অসু কর্মদায়ে। সেইপ্রকার রক্ষণাবৃত্তত্বগুলো জীবের বাসনাক্ষেত্রে উপকার হইতেছে। সাধু কর্মদায়। যখন স্বরূপাধিকের কল্পনাণু হইতেছে; অসাধু বা অসু কর্মদায়ে। সেইপ্রকার রক্ষণাবৃত্তত্বগুলো জীবের বাসনাক্ষেত্রে উপকার হইতেছে। সাধু কর্মদায়।

যখন কণজন বহু সমস্ত পরামর্শ হইতেছে; সেইপ্রকার হয় ত তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাসান্তঃসরম আর অস্ত কাহারও প্রভূত কল্পনার বহু সমস্ত পরামর্শ হইতেছে। কোনও জীবের মৃত্যুর অগ্রে যেমন কেবল সংক্ষেপই প্রয়োজন সেইপ্রকার কোন জীবের মৃত্যুর নিমিত্ত অসংক্রমেরও আরামকাল থাকিতে পারে। গীতায় বলিয়াছেন—

“ধ্বনিতে নিধিন্ত শোকং পরথস্যোভাবঃ”

বাসনামূল্যের ভোগের জন্য যেকল ঘোকে অবলম্বন করিয়া জীব কার্যে প্রবৃত্ত হয় তাহাই জীবের ক্ষয়, জীবের ব্যক্তিত্ব ধ্রুব। এই ধ্রুব প্রবৃত্ত হইয়া জীব সম্পূর্ণ কৃতকায়া না হইতেও যেহি বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহ। হইতেও তাহা কল্পনাকর; কারণ, বাসনার আংশিক তুষ্টিতে জীব তাহার ব্যবহার অবস্থায় দিকেই কর্মসংশ্লিত অগ্রসর হইল; কিন্তু ব্যাখার আর প্রবৃত্তি বিদ্যাশালীর মহাসাধারিত হইলেও, তাহার। জীবের কোন কল্পনায় নাই। উহাতে জীবের বাসনামূল্যের ভোগের তৃষ্ণা হইতে নাই, মৃত্যুও হইতে নাই। লোকে বাহাকে অধর্ম বলে, পাপ বলে, অপরাধ বলে, কেহ তাহাই অহংকার করিয়া ব্রহ্ম চৈতন্য শান্তির পুরুষে অগ্রসর
হইতে পারে; আমার প্রকৃতিবিশিষ্ট সম্পর্কে কালামায়া করিয়া, পুঞ্জ, বন্দনা ও পরোপকারিণী করিয়া, পর্যাপ্তাহ্নিতের ফলে, তাহার কর্ষণ অনবহাল হইলে আরও দীর্ঘ বাইর, কর্ষণাখিতে আরও অবন্ত হইল পড়িতে পারে। জীবিকাশ্রেষ্ঠ পক্ষে সাধারণ পাপের ধর্ম হয়, আমার সাধারণ ধর্মে পাপ হয়। হুতায় পাপ পূর্ণ্যের ঢিকে কোনো সংস্কার না রাখিয়া স্থা অনিহিত অনুমান বৃত্তায় করিয়া হইল, তাহাতেই সেই বৃত্তায় পূর্ণ তৃপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত নিরুপিত হইলে, মূঘ্যনাল ঘটিতে। বাক্যের বক্তব্যায়ে শীখ্যুক মহাপ্রকাশ বলিয়া শিফটি ছিল; তাহার গুরু তাহাকে রাসায়নিকী কোনো নিরুপন করিয়াছিলেন। অনিহিত তাহাতে বংশী অনুরক্ত ধারিয়াও অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহার তাকাঙ্কার সম্পূর্ণ নিরুপিত ঘটিতেছিল। এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত আরও রহিয়াছে। বৃত্তায় হইতেই দেহের উৎপতি; দেহ শুধু কর্ষণরই যত্র; কর্ষণর জীবন আসা। কর্ষণ ধর্ম এবং এই কর্ষণ মুক্তি।

সংস্কার সর্তে বৃদ্ধি হইলে এই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত করিয়া অনুষ্ঠান কর্ষণ করার প্রতী জ্ঞান; তত্ত্বায় খুব কর্ষণ করিয়া লাগিল। কি এই কর্ষণ করে আমার বাসনা পূর্ণ পাইয়ে তাহার ধর্মীয় জ্ঞান নানা প্রকার কর্ষণ অনুষ্ঠান করিলাম। মাধ্যমে অফিসে বাইরে কাজ শিখিতে লাগিলাম, অপরাধে মধুর বাবুর একাধ সংসারের সর্ববিধ শৃংখলাবিধানে নিযুক্ত হইলাম। ইহাতে এই কর্ষণের চাপ আমার উপরে পড়িল যে, সারাদিনে আমার আর ভিক্ষা অর্জন করিল না। প্রাতে ও রাতে নামজ্জের নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করিয়ে লাগিলাম। অনুষ্ঠান অপরিমিত প্রমে আমার বেদনারোগ বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে শরীরের অতিরিক্ত অবসাদায় সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্ষণের স্বগুহাও করিতে লাগিল; যে সকল কর্ষণে আমার বলতি আকাঙ্ক্ষা, প্রাণে উৎসাহ অনন্দ ছিল, তাহাতে ধীরে ধীরে নিশ্চল ভাব, বিরতি ও ক্রোধ বহীতে লাগিল। তামি অফিসে বাওয়া বন্ধ করিলাম, সংসারের বাঁধাতীর কর্ষণে উদ্যোগী হইল পড়িলাম। ঠিক এই সময়ে একটি সাধুর নিকাশ কত্তান দেখিয়া আমার ভিন্ন বৃন্তমন্ত্রের আর এক জীবন আদোলন উপহার হইল।

পাগলা সাধুর নিকাশ কর্ষণ।

আমাদের বাসনা সম্বন্ধে গ্রন্থাদের পারে বালুর চন্দ্রায় একটি লোক সারাদিন পড়িয়া থাকে। সকলে তাহাকে 'পাগলা' বলিয়া থাকে। পাগলা কখনও গলাতীরে বসিয়া থাকে, কখনও উৎসাহ বালুর উপরে শুইয়া থাকে, আমার কখনও না আপন মনে চন্দ্রায় উপরে
নিকাম কম্পই ধর্ম

মনে হইলে—গুণত্রয়ের কিন্তু জীবন দুঃখ সংযোগে সম্পাদিত হওয়ার নামই কর্ষণ, এই কর্ষণে ভোগাকাঙ্ক্ষ। হইলে বা বাসনা কর্ষণ হইলেই তাহা সম্পন্ন আর, ভোগালসা পরিপূর্ণ বা বাসনা কর্ষণ হইলেই উৎস নিকাম হয়। জীব বাসনাকে শুধু মিলিত করিয়া শুধু ত্রুটি সমাধিত সকালমধ্যাহ্নে জীবের স্থান অবস্থা স্থানে বদ্ধ করিয়া ব্যাপার, সামাজিক স্বভাবের চক্র হইলে সম্ভব বহুমূঢ় হইতে, যদিও ভোগাকাঙ্ক্ষ। পরিভাষায় করে, তাহা হইলে আসক্তি পরিপূর্ণ পণ্তস্থায় যে কাৰ্য্য নিপাদিত হইবে তাহাই নিকাম কর্ষণ; এই নিকাম কর্ষণরায়। জীব অন্তর্ভুক্ত হইয়া স্রোত অবস্থায় দিকে উপত্যকা হইতে থাকিবে।
এইভাবে একমাত্র নিকাম কর্ষকেই আমি মুক্তি লাভের সহজ উপায় দেয় করিলো।
যে কার্যে আমার কোন প্রাক্তন অন্ধকার নাই, বরং দারুণ বিরক্তি উৎসাহের সহিত তাহী করিতে লাগিলো। মধ্যের বারুর বৃহৎ সংসারের যাবতীয় তার আমার নিজের উপরে লাগিলো। লাগিলো সেই মাতৃকৃতি কচি কচি ছেলে দেয়গুলিকে ছেলে মতে মাতৃকৃতি নিজ হাতে আহার করাইতে লাগিলো। মধ্যায়ে আকাশের কাজে মহাবিমুখ বাবুর সাহায্য করিতে লাগিলো। বাগানে মালীদের সঙ্গে সঙ্গে খাঁকির তাহাদের সব কাজ-কর্ষের তদারক করিতে প্রবৃদ্ধ হইলো। অপরাক্ষে প্রত্যেক বহুসংখ্যক মুলোর ছেলেদের 'জিম্মাতাইকৃতি' শিক্ষা দিতে লাগিলো। কিছুকাল এইপ্রকার করার পর আমার বারংবার মনে উঠিয়া লাগিল, যদি আমি নিকাম কর্ষকারী করি তাহী হইলে ইহৈতে এত উৎসাহ কেন? উৎসাহের মূলে, বাসনা ক্ষয় করা, কর্ষ শেষ করা, মুক্তির পথ পরিক্ষার করা, এইপ্রকার সংসার অন্তরে রহিয়াছে পরিকার বুঝিলাম। নিকাম কর্ষ করিব সময়ে যে কান্না কার্ষণে করি না কেন, তাহাও সকাম অথবা মূলে নিকাম কর্ষের উদেশ্য রাখিয়া, নিম্নায়ক কর্ষতে করিয়া এই ইচ্ছা ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিলো। হতইত সংসারবিষ্কার্থ না হইলে নিকাম কর্ষ করিয়া করিলাম? সদস্য, ভাল মনে বুঝি খাঁকির কখনও সংসারে ত্যাগ হয় না। কার্ষণেতে একতলাবিষ্কার্থ কি প্রকারে লোপ পাইবে? মনে হয়—সদস্যচরণ বহুকাল খাঁকির যদি তাহী অভক্তিতে অভাব্য হইয়া যায়, তাহা হইলে, ধনাহার ও মল মুত্ত তাঙ্গের মত, সংসারের খাড়াবিন্তি অভাব্য ক্রিয়া বোধ করিয়া, উহা কথিতে নিকাম হইতে পারে।
একতলাবিষ্কার্থ আমি পূর্ববৎ আবার ধর্তী ধরিয়া দৈনিক কার্ষণ করিতে আরম্ভ করিলাম। উদেশ্য একতলাবিষ্কার্থ অভাব্য হইলেই একমাত্র নিকাম হইবে।

জ্যোতির্দর্শন।

অবিচলিত একাধারে সহিত অনিমেষ সাধন করিতে করিতে গৌরবের রূপায়, ধীরে ধীরে, এক একটি অন্যতম দর্শন খুঁড়িয়া বাইতে লাগিল। যথাক্রমে তাহা লিখিয়া বাইতেছি—

(১) প্রথমে কিছুদিন হইল, যেখানে প্রভাবপরিমিত, বহ খণ্ড ধননীয় জ্যোতির্দর্শনের ক্ষেত্রে সংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন হইয়া, বায়ার ও দক্ষিণার্থক্রমে, দ্রুতগতিতে, ধীর তরঙ্গে, অত্যন্ত চক্রাবর্তের ধার, চক্র দৃষ্টি হইতে লাগিল। মরুমার্গের কেন্দ্রমহিতে রীতিযুক্ত স্তর কর্তকার।
এই জ্যোতির বর্ণের অনুসরণ।
(২) ৰমধ্য পরিবর্তিত হইয়া উঠা অংশকার হইল। বল্লাকা খেল গোড়া পরিবেষ্টিত উজ্জল, গাছ নীল জ্যোতি দিয়া অবর্তে ঞুনি ও কপণ সহকারে চঞ্চল দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরিব্যাপ্ত মণ্ডল ৩৪ ইংকি পরিবর্তিত দেখিতে লাগিলাম।

(৩) কিছু দিন পরে দীর্ঘের দীর্ঘের উহাও পরিবর্তিত হইল। পীতাভ খেল জ্যোতির্ষ্ণু মধ্যে, পাটাক্ষ হরিণ্য জ্যোতি দেখিতে লাগিলাম। নিকটে এই জ্যোতি নখপরিশিষ্ঠ খণ্ডকার উজ্জল মণিবং স্বর্ণাবলে প্রকাশিত; আবার, দুর্বল অস্থায় অপেক্ষাকৃত রূপকে আকারে কপণসহকারে দৃষ্ট হইতে লাগিল। চক্ষের অমুক্তি সত্ত্বেও সকলের অবশ্য, স্থানে অবস্থান তখন সেখানে ইহা পরিষ্কারূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। ভিতরহইতে মযুরপূর্ণ চতুর্থ প্রতের সহিত এই বর্ণের কতক উপমা হইতে পারে।

(৪) তৎপরে কৃষ খেল খোলাগলাটি বিলুপ্ত হইয়া গেল। নিয়ত মস্তকের মত আকৃতি-বিদ্যুত, হরিণ ও নীল মিশ্রিত, রত্নভূত জ্যোতি নিকটে ও দুরে একই আকারে নিচলংপ্রচার একাশ পাইতে লাগিল। মিশ্রিত বলিয়া, মযুরপূর্ণ বর্ণের কোনও স্তরের সহিত ইহার সাদৃশ্য বুঝা গেল না।

(৫) এখন কদাচিৎ বিচ্ছেদের মত চঞ্চল, অতর্যুত দীর্ঘস্পর্শ গাছ নীল জ্যোতি, ক্ষেন ফণে সিক্ত প্রভা বিকীর্ণ করিয়া মূর্ত্তিমধ্যে অনুরাধার হইতেছে। এই জ্যোতির তুলনা নাই। প্রাচীনলোকে প্রথায় দিশাহারাহইতেছি, অনুরাধারে তেমনই চিত্তে হাতাকার উঠিতেছে।

কর্মত্যাগই ধর্ম।

আমার কোন কর্ষ্যই দাল লাগিতেছে না। নিয়ত আসনে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। লোকে যাহাকে সং কাঠ, পূৰ্ণ কাঠ বলে, আমার কলঞ্চের পক্ষে তাহাকে সে অক্ষর মনে হইতেছে।  প্রকৃতির অমূল্য বিচারবিদ্যাতে এখন আমাকে সমস্ত কর্ষ্যই নিরূপ করিতেছে। মনে হইতেছে, সমস্ত কর্ষ্যই ধর্মীয় বিদ্বেষী। জীবাধার সমাপ্ত সম্প্রমাণে ভগবানের সহিত সংলগ্ন থাকাই ধর্ম। চিন্তাকে বা জীবাধার ক্রমবিকাশের পাতলই কর্ষ্য। সুস্তৃতাং কর্ষ্য সর্বদাই জীবের বহিষ্কৃত অবস্থা। ইহার পরিণাম চিন্তাকের সর্বভাবাঃ-হইতে খালিত হইয়া ৰমধ্যঃ স্থলেহইতে স্থল-তের পরিণতি। মনে স্থলে জীবাধার কর্ষ্যের সমাধ্য তথায় তাহার বিকাশেরও নিয়তি। সুস্তৃতাং দৈহিক স্থল, কর্ষ্যইতে কৃমে কৃষ্ণ মানসিক কর্ষ্যেরও নিরুত্তি ঘটিতে জীবের সহায়তার্ক্তির বা স্থলতাত্ত্বিকরে।
মূল বিলম্বে সকল মানসরূপেরও অবসান হইবে। তৎপরে জীব যতই সৃষ্টিতে কর্ম তাগ করিয়া নিক্ষিপ্ত বা বিদ্রুপ হইতে থাকিবে, ততই বাসনাবর্জিত সুরুপাবহার দিকে উপনীত হইবে। এজন্য যাবতীয় কর্মের মূল বাসনাকেও তাগ করিয়া—'আবাস্যক্রু মনঃ কুত্তা না কিন্তু ছিদ্র চিন্তিবে।' নিক্ষিপ্ত ধর্মীয় ধর্ম, যাবতীয় কর্মই জীবনের বিকাশক্রম বলিয়া ধর্মিক বিবেচনা।

* * *

গুরুদেবের অভূত কৃপা। ভিতরে ভিতরে জানেন আলোচনার কর্ষের অস্থায় সমস্তে আমাকে একেবারে উদাসীন করিয়া তুলিল। আমার এখন নেই হইতেছে, কর্ম করা মহা অনর্থ। কিছুদিনের আমি বাহিরের যাবতীয় কর্মই তাগ করিয়াছি। নিত্য আবাস্যক্রু মনঃ কুত্তা আহার নিঃসরণ আবর্জনা বিদ্রুপ বিবর্ধিত ইহা নাম সাধনে পুনঃ সমস্তেরের চেষ্টা করিয়েছি। ঐপ্রকার নাম করার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের রূপ আপনা আপনি চিঠি উদিত হইতেছে। আমার দেহে গুরুর দেহ, আমার প্রকৃতিতে গুরুর প্রকৃতি, এই প্রকার ধারণা নাম অবরোধের সময়ে একত্রে আসি গড়ে। আমার প্রকৃতি অঙ্গপ্রত্যাক্ষ, আপূর্বমুক্ত সুরুপাবহার নেন শ্রীগুরুদেবেরই কলের; তিনি আমাকে আচ্ছাদন করিয়া যেন এই দেহে রহিয়াছেন। নাম অপরের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার অভাবীয় ধারণা চিঠি উদিত হয়। আমি সাধনকালে তফাত ধারণা, নিজের ভিতরে নিজেকে না পাইয়া গুরুদেবেরই দর্শন করি। ইহাতে আমার এই আনন্দ হয় যে, তাহা প্রকার করিবার ভাষা নাই। নামরোধ সত্ব্যদানশ্রু গুরুদেবের নিজের ভিতরে তন্ত্রভাবে ধান করিতে করিতে আমার বাহ্যক্রু যেন বিস্তৃত হইয়া যায়; সুরুপাবহার অবশিষ্ট হইয়া গড়ে; অবিযুক্ত অবশিষ্ট হতে থাকে। গুরুদেবের পরম সুন্দর মনোহর রূপের সুরুপাবহারে আমার ভিতরে যে কি হয় তাহার আব বিলিতে পারি না।

গুরু জানেন আলোচনার সাধনরোচো একপ্রকার যুগপ্রলয় অবস্থা ঘটিয়াছিল। জ্যোতির্দর্শন কিছুকলের জন্য অস্থূল হইয়াছিল। নূতন উৎসাহ, নূতন ভাবে, আমার যখন সাধন করিতে আরো করিলাম, বিদ্রুপপ্রতি সবুজ আলো, খেত আলোর সুখতে সমক্ষ হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। অধ্যাত্মের মধ্যেই মিলিত আলোকচরিত্র খণ্ডে 'খণ্ড জ্যোতির্দর্শন-সম্পর্কত হইয়া পড়িল।' ২য় ফাস্তন অপরাহ্নে, খেত জ্যোতির মধ্যে নথিপতিমণ নিষিড় কালবর্ণ একটি আকৃতি দর্শন করিলাম। ৩য় ফাস্তন তারিখেও নিষিড় না হওয়া পর্যন্ত
প্রথম খণ্ড। ১৭৯

এইরূপ দর্শন হইতে লাগিল। পরে বীরে বীরে যেমন ব্যতীত হইলার পাইতে আরম্ভ হইল, কালজগতে তেমনই ক্রমঃ স্পষ্ট হইতে লাগিল। কালপটি দেখিয়া মনে করিলাম বুঝি বা কুঁড়িরই একাশ পাইবেন; কারণ উপার মাঝায় চুড়ার মত দেখিয়ে লাগিলাম। হাত পা ও আকৃতির গঠন দেখিয়া পরিধার মনে হইল কুঁড়িই প্রকাশিত হইবেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি কাল আকৃতি কুঁড়ি নয়। পূর্বে এরূপ লাগাইল ছিল, এখন দেখিতেছি তাহা উপবিধ। পূর্বে যাহা রুশ ছিল, এখন দেখিতেছি তাহা সূচ। মাঝায় চূড়া নয়, উহা জমাট চূল; আকৃতি ও গঠনে তিন গুরুদেবেরই অভ্যস্ত। তবে খুব পরিধার নয়, অলম্পষ্ঠ। এই রূপের উপরে অনিমিত দৃষ্টি করিয়া ও মন স্বীর রাখি খুব তেজুর সহিত নাম করিতে লাগিলাম। এখন দেখিতেছি আকৃতির বর্ণ ক্রমেই ঘন হইতে চেয়ে। স্থানে অধুনে সর্বত্র সরক্ষণে চেখ বুজা ও মেলা। অন্যত্র এই রূপ একই প্রকাশ। আমার চক্ষে যেই এই রূপ লাগিয়া রহিয়াছে। নামতে রূপের দৃষ্টির, রূপের নামের দৃষ্টির, এই এক অন্তর্ভুক্ত গোপালের দেখিতেছি। এই দর্শন খুলিয়া দিয়া, অমূল্য ঠাকুর কান্ত বিষয় আনন্দে তুলিরাখা রহিয়াছেন। জানি না, এই থেকে আমার কত দিন।

দর্শনবিষয়ে বিচার।

প্রকৃতি যাহার সংশয়নূর্ণ, প্রত্যক্ষবিষয়েও তাহার নানাপ্রকার বিচার বিদর্শন উপস্থিত হয়। আমি যাহা পরিসর দেখিতেছি, তাহাতে তালুর বাংলায়া লইতে ইচ্ছা হইল। দর্শনের ক্রম অমূল্য করিয়া বিচার করিতে লাগিলাম। কালবর্ণ যে আকৃতি এার সর্বদাই চক্ষে রহিয়াছে, হইল কি ? কোথায় ইছা দর্শন হয় ? আর এই দর্শনে আমার আকার কি কল্যাণ হইতে ? দেখিতেছি, অসীম আকারের বিচার যখন তাকাই, অলম্পষ্ঠ অতি বুৎপত্তি কায়চার্য্য নতোম্বশান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। একটি সময় উহার দিকে দুটি হিরি করিতেই দেখিতে উৎস ছোট হইয়া পড়ে। ক্রমে অতি ক্ষুদ্র নিবিড় কালবর্ণ, অমূল্য বিচার করিতে পরিণত হয়। আমি সীমাবদ্ধ হইল দৃষ্টি হিরি করিলে, উহার বিছািি ক্রমঃ ধরন্ত হইয়া সর্বপ্রিয় আয়তন ধারণ করে। কেবল একটি নির্দিষ্ট স্থানে দৃষ্টি করিলে, প্রথমে স্পষ্ট জ্যোতি দর্শন হয়। এই জ্যোতির্ময় স্থানে বা ভিতরে রূপের প্রকাশ। জ্যোতির্ময় কেবল একটি ভাষার উপরেই দর্শন হয়। কিন্তু রূপটি জ্যোতি স্বর্গ অবস্থায় শুদ্ধতেই রহিয়াছে, দেখিতে পাই। এখন এই রূপ বাহির কি ভিতরে দর্শন হইতেছে অমূল্য করিয়া, কিছুই হিরি করিতে পারিতেছি না। কারণ চক্ষু যখন মেলিয়া রাখি, তখনও যেমন বাহিরেই ইচ্ছা পরিধার দেখি, চক্ষু যখন
চক্ষু মেলিয়া ও রুজিয়া। একই একার দর্শন হয় বলিয়া ইহার আশ্রয় কি, তাহা ধরিতে পারিতেছিল না। নিয়ত কোন বন্ধ বা জ্যোতির্বর্ণনা উপরে রূপের একাধিক হইলে বস্ত্র বা জ্যোতির্বর্ণনা রূপের আদায় বৃদ্ধিতাম। কিন্তু তাহার নয়। 
একার ভাবিলাম বুঝি বাহুরূপের আশ্রয়। কিন্তু দেখিতেছি তাহার নয়। কারণ বাহু ত নিয়তই চঞ্চল, কিন্তু রোড় তুফানেও রূপটি হইয়া জ্যোতির্বর্ণনা সত্ত্বেও এই একারে। যদিও একটা বক্তার উপরে জ্যোতির্বর্ণনা একাধিক দেখা যায়, তথাপি ঐ বস্ত্রে জ্যোতির্বর্ণনা আবাদ নয়। কারণ বস্ত্র চঞ্চল হইলেও জ্যোতির্বর্ণনা হইতে থাকে। প্রায় ঝড়ে যখন রুক্ষতের দালা ঘন ঘন কঁপিতে থাকে, অথবা নদীতে যখন প্রায় তরঙ্গ ও প্রায় বহিয়া যায়, তখনও কিন্তু হুইলেন ও চঞ্চল জলে জ্যোতির্বর্ণনা একই স্থানে একই অবস্থায় অচঞ্চল ও স্থিরভাবে অবস্থিত দেখিতে পাই। 
চঞ্চলাঙ্গ স্থান বা বাহু জ্যোতির্বর্ণনা এবং রূপের আদায় নয়, বৃদ্ধিতেছে।
চক্ষু মেলিয়া ও রুজিয়া। একই একার দর্শন হয় কেন? বাহীর একটা বস্ত্র দর্শন হইলে, 
চক্ষুর দেয়া বা ঐ সংখ্যাবশতঃ চক্ষু রুজিয়াও তাহা দেখা যাইতে পারে। কিন্তু বস্ত্র যখন দৃশ্যের আশ্রয় লর, তখন বাহীরে উঠে। দর্শন হওয়া কি একারে বলিব; তবে বাহীরে হইল, আর ভিতরেই হইল, উঠে যে দেখিতেছি সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। ইহাতে এই ঘন ও স্পষ্টত যে পৃষ্ঠ পত্তিতে পারি না; কোনও কুঠর বস্ত্র পরিধান দেখিতে পারি না; দৃষ্টি যেহেতু জ্যোতির্বর্ণনা ও রূপে বস্ত্রটেকে আবার করিয়া ফেলে। চক্ষু মেলিয়া ও রুজিয়া। একই একার দর্শন হয় বলিয়া, এই দর্শন কোথায় কি ভাবে হইতেছে নির্ণয় করিতে পারিতেছি 
না। দর্শনটি যে আমার কলনা নয় বা কোন সংখ্যার ফল নয়, তাহাতে আমার সংশয় নাই।

অনুষ্ঠানের রূপের অনুষ্ঠান।

কিছুকালবৎ দর্শনেই আমি মৃদু হইয়া রহিয়াছি। আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তি দর্শনের 
দিকেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই দর্শনে আমার আমার কি যথার্থ কল্যাণ 
হইতেছে, না তাহা অন্যান্ত উপরে পথে বিস্তার ঘটিতেছে? এ সবমন্ত ভিতরে ভিতরে আমার 
আপনি বিষয় আন্দোলন উপস্থিত হইল। দেখিতেছি রূপটির প্রতি আমার অজ্ঞাত 
আকর্ষণ। ক্ষুদ্রকাল উঠে দেখিতে না পাইলে অন্ত্র হইয়া পড়ি। রূপটিকে আরও পরিকার-
রূপে দর্শন করিয়া জানিয়া যেন এখন সাধন ভঙ্গ করিতেছি। এরূপ অজ্ঞাতের অবস্থা আমার 
কেন হইল? 

১৮০
শ্রীশিশুকুরসঙ্গ। [ ১২৯৬ সাল।]
নথপরিমিত একটি জ্যোতিশ্চর্য মহুয়াকৃতি রুপের ছায়া দিশায়ার। হইয়া পড়িল। স্তগ্রাম চুর্দূরী আর বাকী কি আছে? আধ্যাত্মিক উদ্দেষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সাধনরূপে একক দৃষ্টি যদি নিদ্রিত থাকে তাহা হইলে ইহাতে এত অসংবাদ বা আকর্ষণের কারণ কি? যে কেহ নিয়ম প্রতীচি মত সাধন ভাবন করিয়াছে ত তাহার এসব দর্শন হইবে। আর যদি গোপদেবের কৰ্মায় হই। আমার একটি সংখ্যার অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল দেখিয়া দাওয়া ভিত্ত ইহার সহিত আমার আর কি সুস্থ্য; আজ যিনি দয়া করিয়া যাই এই অবস্থা দিয়াছেন, কালে আমার তিনি আমার কোনও ক্রটি দেখিলে তাহ কাড়িয়া লইতে পারেন। যে বস্ত আমার স্পোন্স্টিত বা নিষ্ঠুর নয় তাহ। হাণ্ডে আমি মমতায় আবত্ত হইতেছি কেন? তার পর এই সব স্থানে চতুর্ভূজ অথবা অন্য কোনকোর দর্শনকে ত কোন কালে কেহ ধর্ম বলে নাই। সত্য, সরলতা, বিনয়, পরিপূর্ণতা, দয়া, সতীদয়েরই অবিরোধে সকল ধর্মনাশ ধর্মশাস্ত্র বিলায় নির্দেশ করিয়াছেন। মানবার্মার এই সকল সদর্ভতি যদি প্রকাশিত হইয়া না উঠিল, তবে এ সকল অদোক্তিক ছবি দেখিয়া আমার কি হইবে? সাধনপথে হুইলর পা চলিয়াই যদি এক বিনু জ্যোতির্মূলে বা একটি রূপের মাধ্যমে আকৃতি ও আবত্ত হইয়া পড়িয়া, এবং তাহাতে অন্য উদ্দেষ্টির পথ অপকার করিয়া ভগবানকে লাভ করিবার আকৃতির ও চেতায় জলাশয় দিয়া উহার লাইয়া সম্ভব থাকিয়া, তাহা হইলে ত আমার চুর্দূরীর একেবারে হইল। গোপদেবের মধ্যে রূপধার্মি স্মৃতিস্থলে নিয়ত আমার চক্ষের উপরে থাকিতে পরিমাণে থাকিবে, ইহু নিশ্চয়; কিছু তাঙ্গাতেই বা আমার কি হইবে? উহার কি ভাববন্ধন করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারি? তাহা হইলে আর এই রূপ শরীরে প্রাপ্তে সাধন ভাবন করিয়া, এত নিয়ম সৃষ্ট্যে থাকিয়া ক্রেটার করিতেছি কেন? সামাজিক রেলভাবাদাতা কুটাইয়া নিয়া এখনই ত সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ লাভ করিতে পারি। গোরুলি ভগবান, বিনুই সিন্ধু, এসকল কথার অর্থ আমি বুঝি না। কোনো অবন্তী থাকিয়া মহাপুরুষেরা একক এই সত্য বলিয়া সাক্ষাৎ দেন আমি না। তবে আমি কিছু নিজের অক্ষত থাকিতে প্রায় সত্য অগ্রহ্য করিয়া কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না।

পুরোহিত তাহ আরো আসাতে দর্শনের প্রতি তেমন মনোযোগ না। রাখিয়া নিয়মনিত্যায় সাধন করিয়া যাহা লাগিলাম। কিছুদিন দর্শনবিদ্যায় একবারেই উদাসীন রহিলাম। আমার সাধনকালে অক্ষত্য রূপের কথা মনে পড়িল। ইতিমধ্যে কবে কবে রূপ অন্তর্বান হইলাম, মনোযোগ না। থাকিয়া কিছুই ধরিতে পারি নাই। এখন এই মধুর রূপের স্বৈর প্রাণে উদয় হওয়ার, উহার দর্শনের জন্য ছটফট করিয়েছি; ভিতর আমার দৃষ্ট হইয়া
লালের প্রভাব ও যোগাযোগ

আজ সকালেরা আসেন বলিয়া নাম করিয়েছি, আর ভিতরের আলায় ছুটিকৃৎ ফুলনাদের বিশিষ্ট করিয়েছি; বান্ধবী (হরিদোহন) লালের লাইগা সহসা আমার সমুদ্ধে ১৩ প্রত্যেক প্রতিভাক্ষে, আমি উদাহরণ প্রদান করি। আলোক ১২৯৬। নিজের বরে লাইগা গিয়া আমার বিকা পাশে লালের আসন লাগিয়া দিলাম। একটি সংবাদের পর লালকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'লাল, হঠাৎ তুমি এখন কোথা হতে কিভাবে এখানে এলে?' লাল বলিলেন—'শীতলাবন গোসাইয়ের সঙ্গে ছিলাম। একদিন হঠাৎ তোমাদের কথা হল; আর, দেখতে আগাছে। অন্যান্য মা বলে পায় হেঁটে চলে এসেছি। রামায় কাপুরের সম্প্রতি বায় সৌভাগ্য মাত্র ছিলাম। রামায় যত্ন মধ্যে আমাকে কেহ কেহ গাড়িতেও তুলে নিয়ে তৈরি করেন এসেছেন।

আসি। তোমার সঙ্গে ত একটি ঘটি বা বিতর্কের আর একধা। বহির্ভাব প্রত্যক্ষ নাই, মাত্র ঐ কোন ও কথাকে দেখিয়া। এতদূর এলে কি একাশে? রামায় কেন কষ্ট হয় নাই?
লাল। না, কই কি? আমি তো বেশ এসেছি। কোন কটাই হয় নাই। গুরুদেব কি কাছে? কই দেখতে পারেন?

নাবালক লাল কি প্রকারে সুদূর স্বীকৃতি বলছিলেন এসদূর পদক্ষেপ, সুদূর ঐ লেট ও কষ্ণমাত্র সবল করিয়া, বিনাকে এখানে আসিলেন, ভাবিয়া অত্যন্ত বিশ্বাস হইলেন।

এই কয়েকমাসের আমাদের বাসায় সাধন ভঙ্গনের একটা সুখদুঃখ শোক চলিয়াছে। ভাগলপুরের বই গণ্যমান লক্ষ প্রত্যহ অপরাধে আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন। ধর্মরথিদের সমিলনে নিতান্ত যেন এ বাসায় উংসব লাগিয়া আছে। স্নায়ুক মহাবিদ্যা বারুর স্বচ্ছতার সৌন্দর্যে সকলেই মুখ হইয়া পড়েন। লাল আসিয়া যেন ধর্মসরোদে একটা প্রচুর তুফান তুলিয়া দিলেন। সকটীর্ণে লালের মহাভাব, আসনে বসা অবশ্য স্বর সমাধি ও অন্যতম বিকাশ এবং ধর্মালোচনায় উহার অসাধারণ পার্থিত্য দেখিয়া সকলেই অবাক হইতে লাগিলেন।

এক দিন আমার লালকে লইয়া শেষে পার্বতী বাবু নিকটে গেলাম। পার্বতী বাবু লালের পরিচয় পাইয়া সম্ভূত হইলেন, এবং ধর্মালোচনা প্রকাশে লালের সমুদ্রে সাধনা বেদান্ত শাস্ত্রের মর্যাদা উপদেশ করিয়া, শেষকালে 'আহং ব্রহ্ম' এই মত স্বাপন করিলেন। লাল চুপ করিয়া সমস্ত গুলিলেন, কোনও কথা বলিলেন না। পার্বতী বাবু তাহাকে ধর্ম বিষয়ে কিছু বলিয়া অস্বীকার করিলেন। তখন লাল সাধারণ ভাবে লৌকিক ধর্মের ছুটির কথা তুলিয়া, এত গভীর তেজের উপদেশ করিয়া লাগিলেন যে, তাহার একটা কথায় আমি প্রচুর করিতে পারিলাম না। দেবরতি, ব্রহ্মান্না ও ভগবৎপালক স্মার্তের একমাত্র ভ্রাতৃর কূপের যে পরমতব লাভ করিয়া থাকেন—এই কথা প্রমাণ করিতে গিয়া, সংগ্রহ, পালং, তত্ত্বরতি, আধ্যাত্মিক ও ভাষায় ভাবি, ধর্মশাস্ত্রের প্রলোচনা বৌদ্ধ মত, সনাতন ধর্মশাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া, স্বাপন করিলেন। একমাত্র সম্ভূত এক পক্ষের দৃষ্টিকোণে, একটি অস্ত্রিকের, অথবা এক মূহূর্তের ইচ্ছাকৃতিতেই অন্যান্য শিষ্যের অন্যান্য ব্রহ্মান্ন, তত্ত্বজ্ঞ, ভগবদ্বৎ সমারি ও প্রতিষ্ঠিত হয়, লাল ইহুাই পরিকারচরণে বুঝিয়া দিলেন। পার্বতী বাবু শুনিয়া স্বীকৃত হইয়া বলিলেন; পরে, স্বর ধারায় না পারিয়া, সাহায্য হইয়া লালের পদতলে পড়িয়া বলিলেন—“আপনি আমাকে উদার করিতে আগিয়াছেন। কোথায় ধারায় আপনি এই পরমফুটের কথা বলিলেন, আমার সীমাবদ্ধ সংঘটীত তাহার মিলিতাম্ব থাকি না। আপনি আমাকে একটু দশা করুন।” ইহার পরহিতে পার্বতী বাবু পুনঃপুনঃ লালের সঙ্গ
করিতে আমাদের বাসায় আসিতে লাগিলেন। ইহাতে ভাগলপুরে লালের নাম সর্বত্র প্রচারিত হইয়া-পড়িল।

১৩ই ফাল্গুন আমি একখানা পাত্রগুল দর্শন পাইতেছি, লাল জিজ্ঞাসা করিলেন—
“ও কি পড়িতেছে?”

আমি। পাত্রগুল।

লাল। এ হর্কায়ু তোমার হ’ল কেন? ও সব পড়ে কি হবে? একটি লাইন'-ও বুঝবে না; বুঝা সময় নাই। নাম কর না, সকল শাস্ত্র গুরুর কুপায় নামের ভিতর দিয়া অস্তরে একাশ পাইবে।

আমি। লেখাপড়া মোটে না করলে শুধু গুরুর কুপায়, গুরুর বেশ সরস্বতীর বরজুর হওয়া যাবে, এ কথা এ যুগে নাবালকেকেও বলে না।

লাল। এটি আমার কুন্দিন্নার নয়। গুরুর কুপায় বাস্তবিকই সব জানা যায়। এটি আমি প্রত্যক্ষ করে বলেছি।

আমি আবার লালের কথায় প্রতিবাদ আরম্ভ করিলাম। লাল তখন আমার হাত হইতে পাত্রগুল নিয়া, এবং এর প্রথম পুঠায়, মধ্যে ও শেষ পুঠায় মাত্র কয়েক সেকেন্দ্রের জন্য একবার একটি দুটি কিডিত কিডিতির পুত্রকথায় নিজ মতকে কিছুক্ষণ ধরিয়া রহিলেন; পরে তখনই আবার উঠা আমার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—“আচ্ছা, এই নেও। আমি তো মাত্র শিশুশিক্ষা—তৃতীয়ভাগ পর্যন্ত পড়েছিলাম; আমার বর্ণজ্ঞানে এ গুরুর উচ্চকল্পনায়তাও কুলায় না। ভাল, তুমি আমাকে এ গুরুর যে কোন স্থানহইতে প্রের কর, যেখানে যে একাশ আছে, আমি ঠিক সেইস্থানেই বলে দিচ্ছি।” আমি অভ্যন্ত কৌতুহলপ্রকাশ হইয়া। এরূপের নানাগতহইতে ৭১৮ টি এক করিলাম। টাকাটাকানাই হয়ে বিষয়ে যেমনটি নীচাংস। এগুলো আছে, অন্য অন্যের লালের মুখে ঠিক সেইস্থানের উত্তর পাইয়া, আমি বিশ্বের গুরুত্ব ও নির্ভরাহি হইয়া বলিয়া— ‘এ কি কাজ! ’ কিছুক্ষণ পরে লালের জিজ্ঞাসা করিলাম—‘ভাই, এ অন্তরর শক্তি তুমি কি এখানে লাভ করিলে? ’ লাল বলিলেন—“গুরুরপুরা! এক দিন গুরুঘ্রাত। শ্রীযুক্ত স্রষ্টাদেব সিংহ ( ডিং ম্যাফিয়েট ) সহায়তার সহিত তাহার বাসায় মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করিতে ছিলাম। শ্রীরাম বাবু হাটঘর উঠিয়া বাহিরে ভিতর গেলেন। আমি তাঁর বলিলেরই বলে রহিলাম। টেবিলের উপরে একখানা ইংরেজি মনোবিজ্ঞানের পুস্তক ছিল। মনে হল—লেখা-পড়া শিখিতি নাই। যদি শির্ষ্টান, এ সব পুস্তকে কি বিষয়ের মীমাংসা আছে অনুতে
পার্থম খণ্ড। ১৮৫

পার্থম খণ্ড। ১৮৫

পার্থম খণ্ড। ১৮৫

পার্থম খণ্ড। ১৮৫

পার্থম খণ্ড। ১৮৫

পার্থম খণ্ড। ১৮৫

পার্থম খণ্ড। ১৮৫

পার্থম খণ্ড। ১৮৫
বলামাত শেঁ। শেঁ। শেঁ। দেশ কি যেন একটা ঘাসিয়া আমাদের ঘরের গাছের দিকের জানালার হটম করিয়া পড়িল। জানালা ও সারিক কপাট ভিতর হইতে বন্ধ ছিল; অশ্চিয়ার বিষয় এই যে, জানালাটি অক্ষুং খুলিয়া গেল এবং কাচের কপাটের তিনখানা সারি চুরমরা হইয়া ভাজিয়া গেল। আমরা সকলেই চমকিয়া উঠিলাম, অবাক হইয়া একে অন্যের প্রতি তাকাইতে লাগিলাম।

লাল কিছুক্ষন চুপ করিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"এ কি? এ কি দেখি? আমি মায়োঁককে চিঠি ডালে! কি ভর্তর! উঃ, কি ভাবনা চিতা! ঐ দেখি, ঐ দেখি।" ব্যাঙ্গাজী তখন চীৎকার করিয়া বারেন্দ্র গির্জা পড়িলেন; "হায়, হায়—এ কি হ'ল? এ কি হ'ল?—জীবন মানুষকে চিঠি আলাল।" কন্যকবার এইরূপ বলিয়া, তিনি কামিতে কামিতে মৃদুচি হইলেন। পায় দুঃখ ঘটিতে চীৎকার করিয়াও তিনি চিঠির কথা মনে করিয়া অহংকার হইতে লাগিলেন। লাল তখন এক একবার শুক্ররিতা উঠিয়া বলিতে লাগিলেন—"ধরোকি এখান আম আজ উত্সব হইল। হায়, হায়!"

ব্যাঙ্গাজী তখন বিনাক্ষেপে নিজের গায়ের কষ্টগ্নান। লালের গায়ে পরাইয়া দিয়া তাহার কোপনটি টামিয়া নিলেন; পরে, আমাকে হাতভাঙ্ড করিয়া বলিলেন—"ভাই, কিছু মনে ক'রে না, একটু পাগলমায়া করি।" এইরূপ বলিলা, বারেন্দ্রের বোধক হইতে লাফাইয়া নিচে পড়িলেন, এবং উর্দু হাসে গাছের চড়ার উপর দিয়া দোভাইয়া আত্মহইলেন। রাত্রি প্রায় দেড়টাই। কিছু পরে লাল বলিলেন—"আর ব্যাঙ্গাজীর অসুস্থতা নিও না। তিনি বুঝানির দিকে চুপ করিয়াছেন।" তখনি মথুর বাবু চিনি ব্যাঙ্গাজীর অসুস্থতা করিলেন; কিন্তু কোনও বোধকথা পাইলেন না।

আমার ভগিনীগতি মথুর বাবু লালের অসাধারণ অবহ্ষা ও যোগ্যত্বের অনেক কথা লোকগণপর্যন্ত শুনিয়াছিলেন। তিনি লালকে নিজের বাসায় পাইয়া সেখানকে কিছু প্রায়কে করিয়া লালের 'পিছু' লইলেন। লাল উঠার অমুরোধ এডাইতে না পারিয়া, এক দিন মথুর বাবুকে নিজস্ব ভাগ্যা নিলেন; পরে আমার মৃত ভগিনীকে পরলোক হইতে আহরণ করিয়া আমিনা অনেক আশ্চর্য ও বিচিত্র গুহ কথা শুনিলেন। কন্যা স্বদশিতা ব্রহ্মলোকের কুচাদি ভানিয়াছিলেন যে তাহে অকালে আমার ভগিনীর অমুকালীক মৃত্যু ঘটে, সে সময় বিবরণ শুনিয়া মথুর বাবু অত্যন্ত হইলেন। ঐ ব্রহ্মলোকটিতে আরও যে সময় এই শ্রেষ্ঠ সাংঘাতিক অনুষ্ঠানের স্তূপ হইবে, তাহাও লালের পরিকার করিয়া বলিলেন। মথুর বাবু ব্যাঙ্গাজীর বাহা এ সংসারে আম কেহই জানে না, এমন কতক্ষণে শুনি বিভিন্ন লালের মুখে শুনিয়া তিনি বিশেষে অবাক হইয়া গেলেন।
ফাহান। ]
প্রথম খণ্ড। ১৮৭

আমাদের বাসায় তুতি প্রেমের নানাপ্রকার গোলমাল দুর করিবার জন্য প্রথায় হরিনাম সংরক্ষণ ও তুলনীমূর্ড এবং সাধারণজনদের বাসায় রাখিয়া তুহাদের সাধন ভঙ্গনের অব্যবস্তা করা আবশ্যক। লাল এ বিষয় মথুর বারুকে বিশেষ 'ঝেদ' করিয়া বলিলেন।
মথুর বারুক তুহার উপদেশ মত চলিতে সমর্থ হইলেন।

পরে লাল এক দিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঠাঙ্গা কোথায় চলিয়া গেলেন।
তিনি চলিয়া যাইবার পর আমরা সকলে বিষয়ে মুখ্যমান হইলাম। আহিরশি আমাদের বাসায় ধর্ষণের যে বিষয় প্রচুলিত থাকিয়া আমাদিগকে আলোক দিয়াছিল, লাল চলিয়া গেলে 
আমাদের অন্যের শিখিল ও অবসর হওয়ায় সেই বিষয় দীর্ঘে ধীরে নির্বাচিত হইয়া গেল।

লাল ও আমাদী অক্ষুঙ্গ চলিয়া গেলে পরে, আমারের প্রাণ বুঝিয়া অহির হইয়া পড়িল।
বিষয়ে সমস্তই যেন শুনি মরে দেখিতে লাগিলাম। সাধন ভঙ্গনের উংসার উংসার কিছুক্ষণে বাংলা একেবারে নিয়া গিয়াছে। নিয়মিত সাধন আর মাই।
আসনে বসিলে অস্তিত্ব আসিয়া পড়ে। খান প্রধান ধরিয়া আর নাম করিতে পারি না, ৩৪ মিনিটেই হয়রান হইয়া পড়ি; মনে হয় যেন সাধনাত্মক বোঃ লইয়া টানাটানি করিয়েছি।
আসন তাপ করিয়া উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা হইয়া গেল। গুরুদেবের দৃশ্য কৃপা সম্প্রদায় সহিত আমি অগ্রে করিয়াছি, ইচ্ছা হইল আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়।
এখন এই অপরাধেই দুঃখ ভোগ করি; সাধন ভঙ্গন আর করিন কি? হাহাকারেই আমার আহিরশি কাটিয়া যাইতেছে।
করিয়া দিনাবারে রোগের ঘরে অতিশয় বৃত্তি পাইয়াছে; ইচ্ছা আর সহ করিতে পারিতেছি না। শীঘ্রে এর মন এমন একটি কিছু নাই, যাহা ধরিয়া তিলমাত্র আমার সাহি।
নৈরাজ্য প্রতি যেমন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা জানিতেছি।
মহাপুরুষদের আকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক করিয়াই এ সময়ে কতকটা স্বাধি হইতেছি।
আমাও এই হৃদয়ে গতিকে জানিয়াই বোধ হয় লাগা। বাবা বলিয়াছিলেন—“বাচ্চা, বাবুডাও মত। গৌরী
তোমাকে ভব রূপ করিয়া। উনুন্নত ওপর তোমার সাহিত ভক্তি বন্ধ যায়ে।”
গতিতদাস বাবা বলিয়াছিলেন—“খোদা রোধে তোমারা গুরুভক্তি লাভ হোঁকা, দুঃখ ছো যাওয়া।”
গুরুদেবও বলিয়াছিলেন—“চেলে বয়সে সাধন পেলে; জীবনের কত উদ্দিত লাভ করিতে পারবে, দুঃখ হ'লে যাবে।”—ইত্যাদি।
সেই এসব মহাপুরুষদের বাক্য সত্য হইয়া, যদি আমার সত্যসংসার সত্যবাদী গুরুদেবের বাক্যও অস্ত হয়, তবে আমার আমাকে চিন্তা কি? রোগে আমাকে জলে লিখিত ও অবস্থায় করক না কেন, দুঃখচাচাচে আমি যতই ভাবি যাই না কেন, পরিপাল্নে আমার কল্পনা অবশ্রেষ্ঠায়।
আমার প্রতি লালের উপদেশ।

লাল আমাকে তিনটি কথা বলিয়া গেলেন—(১) ভায়েরী লেখা ছাড়িও না। ভবিষ্যতে ১৭ই ফার্ন, ঈহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। (২) সাধন ছেড়া না, খুব নাম ১২৯৩। কর; তুমি সম্পাদী হবে। (৩) গুরুদেবের কপালে নিয়ম কিছুই হইবার যে নাই; গুরুতে একটি হও; তাহার সঙ্গ করিতে চেষ্টা কর।

আমি তো কিছুকাল হইতে সাধন ভঙ্গ একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছি। অনাবস্থক কর্জের স্ট্যটি করিয়া, তাহাতে দিন রাত কাটাইতেছি। নিজের কিসে কল্যাণ বৃঞ্জিয়াও তাহা করিতে পারিতেছি না। বাজ কাজে, বৃথা গলে, দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেছি। ভিতরে আমার হা হতাশ ও আলা, বাহিরে আমার কথা মিশ হইবে কি একাকে? বন্ধুরাও এখন আমার সঙ্গে উত্তুল হইতেছেন। আমি সিংহ ফাঁপের পড়িয়াছি।

অধ্যাত্মী ব্যাক্যাসংযম।

আজ রাতে এক বধ দেখিলাম। গুরুদেবের সঙ্গপ্রত্যাহার ছিটাইয়াছি। মৌল ভুকানে ২২শে ফার্ন, বহ চর্চাপথ অতিক্রম করিয়া, গুরুদেবের নিকটে পাকিছিলাম। দেখিলাম, ১২৯৩। গুরুদেব মেনী। সেখান দৃষ্টিতে যাহার পানে তাকাইতেছেন সেই অনন্দে ডুবিয়া বাইতেছে। আমি গুরুদেবাদের সঙ্গে সারিগঞ্জ উষ্ণবিবর্তন করিতে লাগিলাম। গুরুদেব আমার দিকে একটু বিষক্ষেত্রে তাকাইয়া বলিলেন—"উঃ, বাবা, তুমি এত কথা বলতে পার!" কথাটি ওনিয়াই আমার নির্দেশ হইল। বৃত্তিকা গুরুদেব আমার বেশী কথা পছন্দ করেন না। অনাবস্থক কথা আর কহিব না, স্থির করিলাম।

সম্মানের অবস্থা সন্দেহে উপদেশ।

আমি তুষ্ণসাধনশৃঙ্খল, বেচ্ছাচারী ও ভঙ্গক দাসছাপার হইয়াও, গুরুদেবের এই অনাবস্থাতে, শাসনবাক্য তুলিতে পারিলাম না। কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করিলেই ১২৯৩। গুরুদেবের সেই দৃষ্টি, সেই কথা কেন্দ্রে মনে আসিয়া পড়ে; আমি আর কিছু বলিতে পারি না। লাল চটিয়া যাওয়ার পরে, ১১৫ দিন অন্তর অন্তরই বধ দেখিতেছি—ধন আমি সন্ত্রাসী হইয়াছি। আমার সঙ্গে লালের ভবিষ্যতের শোনার ফলেই এইকরণ হইতেছে মনে করিরাহিলাম; স্বতরা তেমন আহার করি নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি—সব বধে আমার ভিতরে এক তুমুল কাও চলিতেছে। সম্মানের নিকেতে বেগুনার
শরীরের আমার মন তিন ক্ষীণ হইয়া পতিত ছিল। মনের উৎসাহ তুমালোকের রাজ্য যাপন ও অনিবার্য জ্ঞানগণ অতিরিক্ত কৃত্তিকা করাতে অস্তেতের মধ্যেই জীবন শীর্ষ, কক্ষাবৎ হইয়া পড়িলাম। আমার শ্রীলজ বর্জ্যবাদেরা আমাকে বাঁধবার সাহায্য করিয়া লাগিলেন; কিন্তু, মনের অনিবার্য আবেগে কাহারো কথাতেই আমি কর্ণণ করিলাম না। তাবিলাম—সুরদের রূপযুক্ত কাহারো কথা আমি বর্জ্য হইয়াছি, দুর্বলতা দ্বার কতক্ষণ ধরিয়াছি।
সাধনফল হারাইয়াছি, তখন এইবার নিজে শেষ চেটা করিয়া দেখিব ; অকৃতকাজ্য হই, দেহ পাত করিব।

আমি মানেদিকাল অবাধে বধারিত নিয়মাঙ্কি প্রতিপাদন করিয়া চলিলাম। ভিতরে ভিতরে খুব ভরসা জিনিস ; রাগমুক্ত হইলে, নিজে চেটায় সাধনবলে আনায়াসেই সর্বাংশের উপযোগিতা লাভ করিতে পারি। এই সময়ে একটি আশ্চর্য বৃথা দর্শনে আমার অবিশ্বাস চূড়া হইল। বুঝিলাম সর্বাঙ্গশত্রের চেটা আমার পক্ষে বিভৃতনামাত ! আমি বিষম অবস্থায় পড়িলাম।

আমার খুছিত হাতে মনোমোহন আমা অপেক্ষা নয় দিনের বড়। একই চুলিতে অষ্টমাঙ্গণ করিয়া আমরা একই সংসারে প্রতিপাদিত। এরূপ বৎসর বয়স্কমাত্রে মনোমোহন ব্যাঙ্গল অবলম্বন করিয়া সতানিথি উপাসনার্থে জীবনপস্পর্শ, অকলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। তাহার দেহতাণ্ডের তিন দিন পূর্বে বপ দেখিয়াছিলাম, মনোমোহন আমাকে আসিয়া বলিল—“ভাই, আমাকে দেখিয়ে ইচ্ছা হয় ত শীঘ্ৰ এস এবং আমি চলিত।” আশ্চর্য এই যে, ঘটনায়ও তাহাই হইল।

বছরীকালের গত রাতে বপ দেখিলাম—ভাই মনোমোহন সর্বাঙ্গশেষে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। উহাকে দেখিয়া খুব উল্লাসিত হইয়া বলিলাম—“বাং, তুমি সর্বাঙ্গী হয়েছ ? বেশ! আমিও সর্বাঙ্গী হয়ে তোমার সঙ্গে থাকব।” সর্বাঙ্গী ভাই বলিল—“সর্বাঙ্গ তো তেক নয়; উহা যে অবশ্য; জিতেকা না হলে সুমিশ্রিত হয় না। যত সংস্ক ভাবাচ, তত সংস্ক নয়।”

আমি। কমিনিসেষ্টতেও আমার চিত্তবিকার হয় না। সর্বাঙ্গসের উপযোগিতা আমার ব্যবহারেই আছে।

সর্বাঙ্গী ভাই বলিল—“বেটে ? আছো, একবার লাগাতা হও দেখি।”

আমি অবমানিত উল্লাস হইলাম। আমাকে দেখিয়া, সবই হাসিরা, সর্বাঙ্গী ভাই বলিল—“হ’রেছে, হ’রেছে ; এবার কাপড় পর। এই উপযোগিতা নিয়ে সর্বাঙ্গী হবে ? এখন ঐ সঙ্গ ছোড়ে দাও। উপস্থ থাকুক যথার্থ সর্বাঙ্গ হয় না। সাধন ভঙ্গনের অভাবে উপস্থকে সংস্ক করে দেখিয়ে লয় করতে হবে। না হ’লে হবে না। এখন সাধন কর, খুব নাম কর। শুরুর কুঁপা হ'লে সবই হবে। বায় হয়ো না। আমি চলিত।

আমি বলিলাম—“সর্বাঙ্গের লক্ষণ যা বলে তোমার তা কতদূর হ'রেছে, দেখতে চাই।”
পাপপুরুষের আক্রমণ।

মহামাত্রের মুখে শুনিয়াছি, নিজেও বহার প্রাঙ্গন করিয়াছি, উদ্দেশ্যসহকারে নাই মান, সাধন ভাঙ্গ, অর্থাৎ করিলেই সেই সঙ্গে অলক্ষিত হইবে ১৩১। সাধকের অভিমানকে আশ্রয় করিয়া, ভয়কর একটা পিয়াচকতি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকে। সাধকের আত্মিক কাঠরতা বা বাহিক দীনতার, কিন্তু অভাব হইলে, আরো নিয়ম নিঃসন্দেহ এটা অসঙ্কর্ত্বনান্ত জ্ঞাত বা অজ্ঞাতার সামঞ্জস্য থিয়া পড়িলে ঐ নিদর্শন পিয়াচ অনন্তে প্রবল বেগে সাধককে আক্রমণ করে এবং নানাপ্রকার হর্ষমূলী হর্ষতি চিত্তে উদ্রিক্ত করিয়া কদাচারে ও ব্যাধিচারে সাধককে অতি অতিক্রম হইতে উপনীত করে।

অতি কিছুকাল কথারতার পথে চলিয়া একটা সাধন করিতেই বিতরে ভিতরে অভিমান কমিল—বুঝিতে আমি ভিতরকাম হইয়াছি। অন্দ্রে এই ভাবের উপর হওয়াতেই দর্শনীয় সংগঠন আমার দর্শন চূর্ণ করিতে অতুল্য উৎপাতের স্থান করিলেন। জননামধ্যে নিজজন বাগান উৎপাদনের পক্ষে সর্বপ্রকারে উৎপাদন মনে করিয়াছিলাম; তাই একাং
গ্রামে সাধন করিব আশায়, পুণ্য বৃক্ষ তমালগুলি সিদ্ধ মহামায়ার বঞ্চনাধুন, সংহিষ্ট পূর্বক সাধনের বলে অচিরেই আমি সংগঠিত বিষয়ে কৃতকায় হইলে, নিরাপত্ত অবশ্য লাভ করিব আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রতিষ্ঠা ও অভিষেকের মোহে অন্য হইল। এখন আমি বিষম অফ্ফ-কুপে পড়িয়াছি। এ আগে আমার আর উপায় নাই।

নানাপ্রকার অভিচারিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য ভালবাসার প্রসিদ্ধ। ইত্যাদি লোকের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর হৃদয়বিদ্ধ প্রচলন অযস্ত অধিক। 'অভিচারিক' বিষয় সময়ে সময়ে প্রযুক্ত না হইলে উহার শক্তি নাকি হাস পাইয়া যায়; এই জন্য, ঐ কার্যায় বাহার ওষ্ঠাদ নিয়ত তাহার। লোক খুঁজিয়া বেড়ায়। উপযুক্ত জমান ভুটলে, হংসণা রোঁজগারও হয়। কারণ প্রতি সামান্ত কারণে কাহারও বিশেষে অ্যামিলেই, ঐ সব লোকের দ্বারা একে অন্যের কথা করিতে বাণিজ্য, ফুল ছোঁড়া, খুলাপড়া ইত্যাদির চেষ্টা করে। এই উৎকট শক্তি পাত্র বিশেষে প্রযুক্ত হইলে নাকি তাহার জীবননাথে ঘটিয়ে পারে।

আমাদের বাগানের সূলয় উত্তর গ্রামে একটি ভবলোক আসিয়া একখানা বাস ভাড়া খুঁজিতে আছেন। লোকটি সাধুপ্রভুতি ও ধার্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠাবালী হিসেবে তাহার সঙ্গে আমাদের বিশেষ একটু ঘনিষ্ঠতা জনিয়াছে। কিছু দিন হয় তাহার একটি পঞ্চমশয়ীয়া যুবতী কুটী। এই অভিচারিক উৎপন্নের বিষয়া হইলে মোটামুটি একটি বিষয়া বিষণ্ণ হইলে। লোকটির একটি শুভস্তর জনিয়াছিল, কিন্তু ক্ষমতায় অনাহারে মারা পড়িয়াছে। যুবতী আরও নানা প্রকার উৎপাত তোল করিতেছেন। অসাধারণ রূপ লাভাই উহার এই উৎকট বিষণ্ণতা ছেত্তু হইলে। নির্জন তমলতায় অহিমিষি আমি ধূমি আলিয়া বসিয়া থাকি; অতএব নিশ্চয়ই আমি একজন শাক্তিশালী মহাপুরুষ, এই রকম একটি কুলসংখ্যার এখানে অনেককে তিনি অন্যমে জনিয়াছে। আমার শুধু একটি কুঠারণ প্রজোতিতেই মোটোরের এই সব 'উপরি' উপদেশের শান্তি হইলে, এই প্রকার ধারগুলিতে মোটরের পিতা পেছন করিয়া আমাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। পরে সেই শূন্যতার কথায় নির্জন ঘরে একাকী আমার হাতে অর্পণ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। উদ্দেশ্য—মন খুলিয়া মোটর তাহার সব হংসরে কাহিনী আমাকে বলিলেন। লোকাতীত। সরল। যুদ্ধত অতি কাতর ভাবে আমাকে কহিলেন— "আপনি দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। কোনও ছুটি লোকের কুঠারণ প্রজোতের কথা দিন পূর্বকই আমার একটি জন একচিত্তে একবিধি গিয়াছে; অপরটিতেও একটি খুঁট ছুষ নাই। তাই, বুকের ছুষ অভাবে, অনাহারে ছেলেটি
[জৈষ্ঠ। ]

প্রথম খণ্ড।

আমার মায়া পড়িয়াছে।” — এই বলিয়া, শোকবিহীন বালা অস্কন্তে রুক্ষের বন্ধ। বুলিয়া আমাকে দেখাইলেন। যুবতীর বুকে বাম দিকের হস্তের কোনও চিহ্ন নাই। দেখিয়া আমি অবাকৃ হইলাম। অপরটি বাড়াইক, বুলি ও হংসগন। আমার দৃষ্টিতে ও কর্মরূপে কুঁত্তের দুটি চুটির যাইবে, মেয়েটিই এইরূপ ধারণ হইল। উহার আগের হাসে ধাতনা ও অন্যের অগ্রে আমার চিত্তে স্পষ্ট করিল। আমি বহুন্তাবে ও অস্কন্তে উহার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়া। আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া আসিলাম। ইহার পরহইতে সেই নিজস্ব বাগানে আমার দর্শনাঙ্কজায় মেয়েট গভীর আসিতে লাগিল। আমি দুই হইতে উহাকে আশীর্বাদ করিয়া অপন কার্যে নিযুক্ত রহিলাম।

কংকালিন পরে দেখি, কোন দিন মেয়েট ধারায় না আসিলে আমার মন অস্থির হইতে পড়ে, উহার রপের স্নেতে আমার চিত্তে চঞ্চল করিয়া তুলে। আমি আর তখন আসিয়া থাকিতে না পারিয়া, সেই বাগানে ইত্তরতঃ গুড়িয়া বেড়াই। আমার কখন কখন উহাকে দেখিতে উহাদের বাড়ীর পাশে ঘাটিয়া ঘাটাইলাম। হায়, হায়—এ আমার কি দশা ঘটিল? আমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম? আচরণ সমক্ষে গোড়ায় সাবধান না হইয়া অস্থির হৃদরুদ্ধির সঙ্গ আকর্ষণে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া, যেন নরককুলে আসিয়া পড়েছি। আমার সমস্ত দেয় নয় হইয়া, পরিচয়ে, সর্বনাশ হইয়াছে। এখন নিজের অতি জলশ্ব বলিয়া অণুভব করিতেছি। নিয়ত হা হতোপর উঃ দীর্ঘ নিকাশে আমার দিবারাত্রি অতিবাহিত হইতেছে। সাধন ভজন সমস্ত ছুটিয়া গিয়াছে।

আমি তম্মালপ্প ত্যাগ করিয়াছি, নাম প্রাণীয় ছাড়িয়া দিয়াছি। সমুদ্রে দৌর অঙ্ককার দেখিয়া আতঙ্কে ক্ষুণ্ণ্যায় হইয়াছি। গুরুদেব, এ সময়ে তুমি কোথায়?

কে তুমি?

অত্যাবশ্যক ঘটনা জীবনের হায় ঘটিতেছে, তাব্লিয়া তত্ত্বাত্মক হইয়া পড়ি। গভর্নের কি যে আমি দেখিলাম, বলিতে পারি না। জীবনে কখনও আমি এরূপ দৃষ্টি দেখি নাই। ঘটনাটি গুরুদেবকে সূনাইবার জন্য ধর্মযোগ্য লিখিতা রচিতেছিল।

রাজ্য ১২ টা বাজিয়া গেল। বিচ্ছিন্ন পড়িয়া আছে; সর্বাঙ্গের অনন্য দর্শন সমস্ত খোল। উজ্জ্বল চক্রকিরণে বিচ্ছিন্ন অর্ধেকটি আলোকিত। বেদনার জরুরিত ও ।

২৫
মনের অগ্নিতে আমি ছুটিয়ে করিয়েছি। আকুল প্রাণে গণ্ডাদের চরণে প্রাসাদের করিয়া, "ঠাকুর, আমি তো আর পারি না। এবার তুমি দয়া কর। আমি তোমার ঐ সময়পূর্ব ওই অক্ষর রাখিরা চিত্রালের মত সমস্ত উৎপাদের শান্তি করিয়া।" প্রার্থনায় গণ্ডাদের পরিত্যক্তিধারায় সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি নাম জপ করিয়ে লাগিলাম।

আমি না কখন অজান্তায়, দীর্ঘ দীর্ঘ কামিনীকরণ।* চিঠি আলিঙ্গিত পড়িল।

তাহাতেই আমি অভিস্থত হইয়া রহিলাম। আগের কি নিম্নিত্ত্ব অবহার্য্য ছিলাম, আমি না। অক্ষর আমার পারের দিকে কামিনীর কঠোর চরিতে পাঁজিলাম। কৃষ কঠে, কাতর বরে আমাকে ভিলিও "ও কি ভাবছ এই সে আমি এসিছি। এখন তোমার যা ইচ্ছা।" বিহরে খুব আপনার মনে হইল। বিষ্ণু চিঠিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কে? এ সময়ে এখানে কেন?"

রন্ধন কহিলেন—"তুমি যে আমার স্থির হ'তে দিছ না—টেনে নিয়ে এলে। যথেষ্ট ভুগেছি—আমার একে দিও না। পায়ে পড়ি, আমায় মুকু ক'রে দাও।"

আমি বিশিষ্ট হইয়া বিঠিলাম—কখন আমি তোমাকে ডেকেছি? কে তুমি? এখানে কেন?

কামিনী বলিলেন—"তোমার অন্যম কামভাবে আমার উদ্দেশ্য রুদ্ধ হ'য়েছে, তোমার কামকান্ড ও উৎক্ষেপন সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমার দিকে অক্ষর হ'য়ে পড়ি। তোমার বিকার থাকতে আমার নিষ্ঠার নাই। এখন বাসনার পরিত্যক্তি কর—ঠাণ্ডা হও। আমি বাঁচি।"

আমি বিঠিলাম—কে তুমি? তোমার কথা শুনছি, অথচ তোমাকে দেখতে পাছ্ছি না।

আমি কামিনীকরণ করি—তাতে তোমার কি? তুমি আকুল হও কেন?

যুবতী অন্ধপট ছায়ার মত কিছু একাশিত হইয়া তত্ত্বাবধারের ধারে আমার পারের দিকে আলিঙ্গিত হয়ে পড়ে। পরে বিন্ধান উপরে অর্ধশরীর অবস্থায় পড়ি। আমার পা ছুটে ছাড়াই হয়ে গিয়েছিল। উহার অস্থায়ী আমার শরীরে আনন্দের ধারা সঞ্চালিত হইতে লাগিল। আমি পুনঃপন্ত শিবার্য উঠিতে লাগিলাম।

যুবতী তখন আমাকে বিঠিলেন, "হুই! এই তোমার দশা? কামভাব, কামিনীকরণ—এ তুমি ছাড়তে পারলে না? নিজের সে সর্বনাশ করবে। আর এতে আমারও কত হুঁফিদি, দেখ দেখি। পরমাণুর সঙ্গে ডেকেছি। সবিষ্ট অবস্থ। অভিক্রম করে

* এ সম্পর্কে ঠাকুরের কথা পূর্বে প্রকাশিত 'সদ্যগুল্প' (১২৯৮ সালের ) পরিশীলনার ২১ পৃষ্ঠার উপর হইতেহইতে।
এত দিনে নির্কিরক সমাধি লাভ করতাম। শুধু তোমার সঙ্গে অত্যন্তহতে আবাহ রয়েছি। তোমার বিষয়ে উত্তেজনায় টানে আমাকে উঠতে দিচ্ছে না। আমি নিরাশ হয়ে থাকি। এরার আমায় মুক্তি করে দাও। তোমার আকাশে নিজেই নেও।”

আমি অশ্নিই উঠিয়া বলিলাম— বলিলাম, “তুমি কে, বল না কেন?” রমণী তখন অকপাত তর্কপোষের ধারে বাম পার্শ্বে আমিরা দাড়াইলেন, এবং মধুর ভাবে, বিনয় সহকারে বলিলেন একবার আমাকে ধরে আলিঙ্গন কর না।—পরিচয় পাবে এখন।”

আমি উঠাকে ক্রোড়ে বসাইবার অভিপ্রায়ে যেমন উঠার কাঠদেশে করসংযোগ করিলাম, রমণীর অলৌকিক রূপ দেখিয়া অমনী বিশ্বে অবশান্ত হইল পড়িলাম। আমার শিবিল হইতে খসিয়া পড়িল। উঠার সেই অনুমতির কমনীয় অলের কেবল মাত নাভিদেশ পর্যন্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আমার নিকটে অকাজিত হইল। দেখিলাম, নীলাচলপ্রস্থানী, শ্রীরূপ স্ফৃত বেশে সমুদ্রে দাড়াইয়া রহিয়াছেন। এত, আলোচিত, স্বর্ণ বর্জ্যবরণে উঠার গুলি উদ্ভরয়ের সময়কালে আবৃত। যেহেতু নাভিদেশহইতে পদাঙ্গু পর্যন্ত অসংখ্য ধন নীল বিহাঁ ফুটিয়া উঠিতেছে। অশ্চর্য রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম, উঠাকে ধরিতে আমার আমি হাত বাড়াইলাম। রমণী তখন পশ্চাদিকে কিছুসং সরিয়া আমাকে বলিলেন— “আর কেন? যথেষ্ট হ’য়েছে; আর কামকান্না ক’রে না, আমাকে টেনে না। এবার ভেবে দেখ আমি ’কে। এখন যাই।” এই বলিয়া উঠিয়া কামনী স্থানের উঁচু ছত্তিয় দিয়া কালোতে করিয়া উঠিয়া উঠিতে হইলেন। তখন উঠার প্রতি অঞ্চল প্রত্যঙ্গ হইতে নীল বিহাঁ ফুলির অবিলম্বিত হইল তুলিল। দেখিয়া দেখিয়া স্যাত্রিবর্ণী স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা অনন্ত নীলকাশে বর্ণ মিলাইয়া ধীরে ধীরে বিলীন হইলেন। ‘হায়, হায়, কোথায় গেলে? কোথায় গেলে?’ বলিয়া চাঁকার করিয়া, আমি বাহিরে আমিরা পড়িলাম।

অবশিষ্ট রাত্রি আকাশের দিকে তাকাইয়া কিন্তু যে কাটাইলাম, তাহ। আমার লিখিবার যে নাই।

এই অপ্রাকৃত দৃষ্য দেখার পর অতুল আমার সর্বক্ষণ ঐ রূপ উদয় হইতে লাগিল। দিবারথি আমি উঠারই ধাতে হইলাম। আমার কখন কিছুক সেই অতুল। প্রতিমার দর্শন পাইব—এই সময় শ্রেষ্ঠ অশ্চর্য হইতে লাগিল। অনিষ্টকর যে সকল দৃষ্টিগত কর্মনায় এক কথা স্থক পাইয়াছি, তাহাতে আমার রুচি নাই, বরং বিরক্তির অভিজ্ঞতায়। সাধন ভজন করিলে আমার সেই মনোমোহিনী অপ্রাকৃত রমণীকে দেখিতে পাইব এই ভাবিত। সাধনে।
আমার প্রাপ্তি জ্ঞান। কিন্তু লোকে পড়িয়া সাধন করিতে উৎসাহী হইলেও চেষ্টা করিবার আর আমার সামর্থ্য নাই। দারণ পিতৃশূল বেদনার অস্বস্ত যন্ত্রণার আমি একেবারে শয়তান হইয়া পড়িয়াছি। এতাহুক দুই তিন বার বমি করি; কঠিনাইতে কষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য হইতেছে। গঠন বুক্ত হল গোল করিলেও সেটি পর্যাপ্ত অলিয়া ঘয়। দিন নাছ, একটা দুঃখসহ বেদনার আমার আহার নিত্য গিয়াছে। চক্ষু বণ্টা বিহারী পড়িয়া আহা উচ্চ, উঠিয়া বসা করিতেছি। মানসিক যন্ত্র বহু তীর্থ হউক না কেন, কারিক রেশের তুলনায় উচ্চ কিছুই নয়, এবং ইহা পরিস্কার রুপিতেছি। উৎকট দৈহিক যন্ত্রার উপশমের অত মনে হয়, এমন অধর্ষ অনাচার বা অকর্ষ নাই যাহা করিতে না পারি। এই তে অবশ্য।

প্রথম গুণ সমাপ্ত।